# আজও যা ঘটে

অরূপরতন ভট্টাচার্য

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬২
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
গণেশ বসু
মুদ্রাকর
সরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা ৬

মাতৃকাশ্রম প্রণবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা

যোগিশ্রেষ্ঠ

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ

শ্রীচরণকমলেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

ডাকিনী

তন্ত্র-তপস্যা

কে ডাকে আমায়

গোপন সাধনা

যোগিনী

যক্ষিণী

বহুরূপে দেবতা তুমি

সম্মোহন

তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্র-কাহিনী

কে তুমি

অশরীরী

অবিশ্বাস্য

অজানার আঙিনায়

মানসনয়ন

জন্মান্তর রহস্য

মুকুরে শত মুখ

সীমান্তের সুর

আবার আমি

কে ডাকে আমায়

নীল সায়রে

জীবনের ওপার থেকে

সে কি এলো ফিরে

# ভূমিকা

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর নামটি আজ বহু পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর এই বিচিত্র গ্রন্থের ভূমিকা লেখার প্রসঙ্গে নানা কারণে আমি সঙ্কুচিত। শ্রীব্রহ্মচারী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভেতরে বাইরে মানুষটি স্নিগ্ধ শুচিশুদ্ধ সংযমের প্রতীক। প্রশংসায় যাঁরা সহজে প্রীত হন তিনি তাঁদের সগোত্র নন। দ্বিতীয় কারণ, তিনি জ্ঞানী গুণী এবং বহু দুর্লভ অভিজ্ঞতার অধিকারী। তাই নিজের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে এই গোছের লেখনী ধরা বিড়ম্বনাবিশেষ।

শ্রীব্রহ্মচারীর রচনার দুটি ধারা আমি লক্ষ্য করেছি। একটিতে ধর্মীয় স্রোত স্বতঃস্ফূর্ত, অপরটিতে বিশুদ্ধ কাহিনীর। তাঁর রচনায় এ-দুটির মিলন বড় বিস্ময়কর। এ-মিলন এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর বলেই তাঁর নিছক ধর্মীয় রচনার স্বাদও তেমনি সবল স্পষ্ট পরিপুষ্ট। তাই তাঁর সে-সব রচনা অতি সাধারণ পাঠককেও দূরে না ঠেলে কাছে টানে।

এখানে তাঁর রচনার কাহিনীগত দিকটাই আলোচনার বিষয়বস্তু। 'আজও যা ঘটে' এই পর্যায়ের অভিনব কাহিনীগুলোকে প্রকাশের আলোয় আনার ব্যাপারে ভূমিকা লেখকের কিছুটা কৃতিত্ব আছে। অবকাশ সময়ে শ্রীব্রহ্মচারীর নানা অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে ভালো লাগত। শুধু ভালো লাগত বললে ঠিক হবে না, সে-সব গল্প শুনতে শুনতে আমার ঘরের শ্রোতার আসর এক-একদিন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত, কখনো বা বিস্ময়ে আনন্দে তাঁদের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠত। এ-সব তাঁর পরিব্রাজক জীবনের সঞ্চয়। তাঁর গুরু শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজের সঙ্গে নানা দেশ পর্যটনের সময় এইসব অভিজ্ঞতা তিনি আহরণ করেছেন। শুনতে শুনতে বহুদিন আমার মন সংশয়ে দুলেছে—এমনও কি সত্যিই ঘটতে পারে? আজকের দিনে এ-রকমও ঘটা সম্ভব? আবার ভেবেছি, না যদি সম্ভব, সবটাই যদি অলৌকিক হবে—তাহলে বুকের তলায় এমন আলোড়ন ওঠে কি করে, এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভিতরটা উন্মুখ হয়েই বা ওঠে কেন?

আমার বিশেষ তাগিদের ফলে শ্রীব্রহ্মচারী ঘটনাগুলো একে একে লিপিবদ্ধ করেছেন। এইসব রোমাঞ্চকর ঘটনার বেশির ভাগ 'আজও যা ঘটে' শিরোনামায় যুগান্তর সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য পাঠকমহল আমাদেরই মতো মুগ্ধ এবং রোমাঞ্চিত হয়েছেন।

যাঁদের জীবনে ঐ সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ। তাঁদের অনেকের সঙ্গে লেখক দীর্ঘদিন মিশেছেন। একসঙ্গে থেকেছেন। এর মধ্যে বহু ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। আবার এমন কয়েকটি কাহিনী আছে যা সেগুলির নায়ক-নায়িকাদের মুখ থেকেই শোনা। তাই 'আজও যা ঘটে'র প্রতিটি লেখা এমন সজীব, এমন প্রাণবন্ত।

সংগ্রহের থলি থেকে এক-একটি আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে সাহিত্য ভারতীর পায়ে বিশুদ্ধ ফুলের মতো অঞ্জলি দিয়েছেন লেখক। বিশ্বাস, বইখানা হাতে নিলে এ অর্ঘ্য পাঠকের মর্মমূলে সাড়া জাগাবে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জমীদ সিংয়ের চোখেমুখে একটা উৎকণ্ঠা-বেদনার ছাপ। তার জমাট বাঁধা চাপা কথা সব উজাড় করে দিতে লাগল। জমীদ সিং বলছে, আমি শুনছি। জমীদ সিং বলছে, ভাবতে পারিনি, এক বছরের ভেতর এ রকম অঘটন ঘটে যাবে। একটা অশান্তি ছায়ার মত পেছু নিয়ে চলেছে। ছাড়বার নাম নেই। সারা জীবনে কখনো ছাড়বে কিনা তাই সন্দেহ !······বিয়ে করলুম বড় ঘরের মেয়ে। বংশের নামডাক খুব। আমাদেরই প্রায় সমান সমান। দেশের আজাদী আনতে ওদের কোনো পূর্বপুরুষকে ফাঁসির মঞ্চেও উঠতে হয়েছিল এক সময়। মেয়েটি রূপে গুণে নেহাত কম যায় না।

প্রথমে আমার বিবি আমায় খুব আদর যত্ন করতো। একেবারে অকৃত্রিম। আমাদের দেশেঘরে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেলো—এমন বৌ নাকি আজ অবধি কারো হয়নি এ গাঁওয়ে। স্ত্রী-গর্বের খুশিতে বুক দশ হাত হয়ে উঠতো।

আমি তো বৌয়ের রূপে গুণে হাবুডুবু খেতে লাগলুম। বিয়ের মাস পাঁচেক বেশ সুখে কাটলো। আমি বৌ ছাড়া থাকতে পারিনে, বৌ-ও আমায় ছাড়া অস্থির হয়ে ওঠে। বন্ধু-বান্ধবদের চক্ষুশূল হলুম আমরা তুজনে—আমি আর বিবি।

ব্যবসা ছেড়ে কতদিন আর বাড়ি বসে থাকা যায়? মন না চাইলেও, বাবার তাগিদে আসতে হল অমৃতসরে। জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাছের বাড়িটা তখন সবেমাত্র কেনা হয়েছে। সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। কাজে মন বসে না। কাজ ছেড়ে মাঝে মাঝে আসতে লাগলুম গাঁওয়ের বাড়িতে। সকলের হাসাহাসি, বিবির লজ্জা লজ্জা ভাব, আমারও তাই। মা সব ব্যাপার দেখে শুনে অগত্যা বিবিকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। মুখে না বললেও,

মনে হচ্ছিলো, কতোক্ষণে নিয়ে যাই, নিয়ে যাই। যাক্, আমরা যুগলে জালিয়ানওয়ালাবাগের বাড়িটায় এসে উঠলুম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

দিন আমাদের বেশ হাসি-খুশি গল্প-গুজবে কেটে যেতে লাগলো। ত্বজনেই আনন্দে ডগমগ। আর তিন চার মাস বাদে বিবি মা হবে। কত নতুন নতুন রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলুম আমরা আমাদের ভাবী সন্তানের সুখ সুবিধের জন্যে।

একদিন বিবিকে নিয়ে বাগে বেড়াবো ঠিক হল । সন্ধ্যেবেলা ত্বজনে চলেছি। বাগের প্রবেশপথে এসে বিবি চমকে উঠলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বিবির। তার চোখ ত্বটো চৌকিদারের মুখের ওপর আটকে পড়েছে। চৌকিদারেরও বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি বিবির ওপর। আমি আবার বিবিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললুম বাগের ভেতরে। কিন্তু বিবির কেমন অন্যমনস্ক ভাব। পেছনে চেয়ে দেখি, চৌকিদার একদৃষ্টে লক্ষ্য করছে বিবির গতিপথ। আমার যেন কি রকম কি রকম ঠেকলো। চৌকিদারের দিকে কটমট করে তাকালুম, জানিয়ে দিলুম এটা অশোভন। সে বোধহয় লজ্জা পেয়ে চোখ ফেরালো অন্যদিকে। বিবিকে জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার বলতো ? তুমি অমন হয়ে গেলে কেন ? ওকে কী চেনো ?

একটা যে কিছু অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে গেলো চক্ষের নিমিষে, বিবির চাউনিতে কিন্তু সে-সব কোনো লক্ষণই খুঁজে পাওয়া গেলো না। সহজভাবেই জবাব দিল বিবি, কই ! কী ব্যাপার ! কাকে চিনি ? কী বলছো কিছু বুঝতে পারছিনে তো !

আমি স্তম্ভিত। আমার চোখকে বিশ্বাস করবো, না করবো না ! মনে হল, যে বিবিকে নিয়ে এতদিন ঘর করছি, একি সেই বিবি !

বাগের কুয়োর ধারে আসতে বিবির অস্থিরতা বেড়ে উঠলো। বিবির চনমনে চাউনি চারধারে। রকম সকম দেখে ভাবলুম, আমারই কী নেশাটেশা হল নাকি ? কিন্তু নেশা তো কখনো করিনি। তবে ?

কৌতূহলী মন পেছনে দৃষ্টি ফেরায়। দেখলুম, চৌকিদার অতি

সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে গাছগুলোকে আড়াল রেখে। চৌকিদারের হাবভাব আমার খুব ভালো লাগলো না। আমার মনে একটা সন্দেহের দোলা লাগলো বিবির আর চৌকিদারের চালচলনে —কী জানি বিয়ের আগে, কখনো কী ওদের মন নেওয়া দেওয়ার পালা ছিলো, না এই অমৃতসরে আসবার পর কখন কোন অবসর ফাঁকে প্রণয়পর্ব গড়ে উঠেছে? কিন্তু এ নিয়ে এখানে কিছু বলাবলি করলে, খানদানির বেইজ্জতি হবে। ফেরাই ভালো। বিবিকে বললুম, চল!

কে কার কথা শুনবে! বিবি নির্বিকার। কুয়োর দিকে একভাবে দৃষ্টি। তার কোনো ধারে খেয়াল নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতো ভাবছিলুম, ততো বাগ আর কুয়োর কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে পড়ছিলো—স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকা ভারততীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ, বাগের পবিত্র কুয়োয় এক সময় ও'ডায়ারের নির্দেশে বুলেট বৃষ্টির তাড়নায় কত নিরীহ মানুষ আত্মবিসর্জন দিয়েছিলো। খানিকটা তন্ময়তা এসে গেছিলো আমার। আ যাও, আ যাও ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলুম। বিবির কণ্ঠ।

বিবি কাকে ডাকলো? চৌকিদার একেবারে বিবির পাশে দাঁড়িয়ে। এইসব দেখেশুনে ধারণা হল, নিশ্চয়ই বিবি চৌকিদারকেই ডেকেছিল। গজরাতে লাগলুম, আমার সামনেই এত বড় স্পর্ধা।

অবিশ্যি তার সঙ্গে ইন্ধন জোগাতে লাগলো আরো আরো ঘটনা।

একদিন বাড়িতে এসে দেখি, বিবি নেই। ওপর নীচে প্রত্যেক ঘর মায় বাথরুম পর্যন্ত একেবারে তোলপাড় করেও পাত্তা পেলুম না। শেষে কী মনে হল, ছাদে উঠে পড়লুম। অবাক হয়ে দেখলুম, বিবির নিমেষনিহত দৃষ্টি বাগের প্রবেশপথে—যেখানে চৌকিদার।

মনে হল দুটোকে একসঙ্গে শেষ করে দি একেবারে। খানদানির বেইজ্জতি করতে বসেছে এই জানানা। দি ছাদ থেকে নীচে ফেলে ওই চৌকিদারের সামনেই। যাক্, কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে নেমে এলুম।

রাতে নানান উৎকট চিন্তা পেয়ে বসলো। চোখের পাতা থেকে ঘুম পালিয়েছে। চুপ করে চোখ বুজে পড়ে আছি। একটা খসখসানি আওয়াজ হল। ভাবলুম, আবার কী ব্যাপার! দেখলুম বিবি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছু নিলুম. হাতে-নাতে বিবির অভিসারকে ধরে একটা হেস্ত-নেস্ত করবার জেদ চাপলো।

বিবি সেই নিশুতি রাতে বাগের প্রবেশপথে এসে থমকে দাঁড়ালো। চৌকিদার তখুনি সেখানে উপস্থিত হল। দুজনে একসঙ্গে ভেতরে চলে গেলো। রাতে বাগে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু চৌকিদারের ওই বে-আইনী কাজের মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। এইটাই আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেলো। রাগে হাত নিশপিশ করে উঠলো। সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় টগবগ করে ফুটতে লাগলো।

আমি গোঁভরে চলেছি ওদের অনুসরণ করে করে।

কুয়োর ধারে এসে দাঁড়ালো বিবি। পেছনে চৌকিদার। বিবির কণ্ঠ ভেসে আসতে লাগলো—অতিকরুণ—হৃদয়-নিঙরানো আকুতি মেশানো। মনে হল সেখানে কোনো খাদ নেই, কপটতা নেই—একেবারে সরলতায় পরিপূর্ণ 'আ যাও, আ যাও' ডাক।

আবেগভরা গলায় চৌকিদারের সহানুভূতি উপচে পড়ছে। সে বলছে—বহিন!

আমার ভাবরাজ্য সব ওলটপালট হতে লাগলো। আমি কেমন হয়ে গেলুম। রাগের মাথায় একটা কষে চড় বসিয়ে দিলুম চৌকিদারের গালে। আশ্চর্য হলুম, চৌকিদারের চোখের কোণায় জলের ফোঁটা টলমল করে উঠলো। তবু সে কোনো প্রতিবাদ করলে না। খালি তার ভেজা গলায় বললে, বাবুজী! কসুর মাপ কীজীয়ে! মাথা নীচু করে চৌকিদার চলে গেলো। কিন্তু বিবির কান্না আর থামলো না। একভাবেই কেঁদে চললো। চৌকিদারের বিষয় অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কুয়োর কাছে কাকে ডেকেছে সে কথাও। কিন্তু বিবি নিরুত্তর। কিছু জিজ্ঞেস

করা মানেই হয়ে দাঁড়ালো তাকে কাঁদানো। নতুন ন্যাকামিতে বিতৃষ্ণায় মন অশান্ত হয়ে উঠতে লাগলো। এই ব্যাপার নিয়ে একটু একটু করে সন্দেহের দানাগুলো ক্রমেই জমাট বাঁধতে শুরু করে দিল। বললুম, ঘর যাও। জরুর তুমহারে ঘরমে ও একরোজ আয়েঙ্গে।

একটু পরেই বিবেক ফিরে পেলুম আমি। আমার মাথা তখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে 'বহিন' কথাটা নিয়ে। কী ভুল করলুম আমি না জেনে। অনুশোচনার দংশন আমায় অতিষ্ঠ করে তুললো।

আমি দৌড়ে চৌকিদারের কাছে গেলুম। আমাকে দেখে ভয়ে ভয়ে চৌকিদার সরে যেতে লাগলো। তার হাত ধরে ক্ষমা চাইলুম। বিবির কাছেও। কিন্তু বিবি হয়তো শুনলো না কিছু। একটানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেন কাঁদছে, কাকে ডাকছে ও, চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম। সে যা বললে, সে এক অতীতের মর্মস্পর্শী কাহিনী।

—বারো-তেরো বছর আগে, একবার একটি বছর আটেকের মেয়ে তার ঠাকুমার সঙ্গে বাগে বেড়াতে আসে। ঠাকুমা কুয়োর কাছ বরাবর এসে কান্না চাপতে পারে না। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। মেয়েটি হকচকিয়ে' যায় ঠাকুমার অবস্থা দেখে। ঠাকুমার কান্নার কারণ জানতে চায় সরলপ্রাণের শিশু বারে বারে। ঠাকুমা কথার মোড় ঘোরাতে গিয়ে সত্যি ব্যাপারের কতকটা হের-ফের করে বলে, কুয়োর ভেতর তোর ঠাকুর্দা রয়েছে, তাই ডাকছি তাকে। মেয়েটি ঠাকুমার কথাটি মনোযোগ দিয়ে শোনে। তার কণ্ঠে আকুতি-ফুটে ওঠে। ঠাকুমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে—ঠাকুর্দা তবু আসছে না কেন? ঠাকুমা উত্তর দেয়, নাতনীকে বোঝায়—তুমি ডাকলেই আসবে। মেয়েটি ঠাকুমার একথা বিশ্বাস করে নেয়। ঠাকুমার কান্না থামাতে আর ঠাকুর্দাকে কুয়ো থেকে ডেকে তুলতে কী তার আকুলি-বিকুলি। কী আপ্রাণ চেষ্টা অতটুকু মেয়ের।

যারা এই বাগে ছিলো সেদিন, কেউই চোখের জল চাপতে

পারে নি। অতি কষ্টে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিলো।

তারপর সেরকম প্রায়ই ঘটতে লাগল। মেয়েটি প্রায় রোজই আসত। কুয়োর কাছে মুখ নিয়ে একটানা ডাকত 'আ-যাও! আ-যাও!' সেই একান্ত ডাক শুনে মনে হত সত্যিই বুঝি কেউ কুয়ো থেকে উঠে আসবে।

সে-দৃশ্য চৌকিদারের মনে বসে গেছলো। আজ এতদিনেও ভুলতে পারেনি—মেয়েটির সেই সজল-স্বপ্নালু চোখ দুটিকে। তাই প্রথম যখন সেদিন দেখলো এই বহিনকে সে. তখন তার স্মৃতি উথাল-পাথাল করে উঠলো। সে দেখছিলো, সেই আট বছরের মেয়ে—অবোধ শিশু, তার সরলতা, তার ঠাকুর্দার জন্যে কাতরতা, ঠাকুমাকে শান্তি দেবার চেষ্টা।

বাবুজী ভুল বুঝে, রেগে গিয়ে আঘাত করেছিলেন। সে বলতে চেয়েছিলো. অতীত কথা—এ মেয়ে সে-ই কিনা, কেমন কেমন মনে হচ্ছে যেন তার! কিন্তু সে সুযোগ সে পায়নি মোটেই।

অবসাদ মন নিয়ে, বিবিকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরলুম। তারপর আর কোনোদিন আটকাইনি বিবিকে। আটকালে বিবির অস্বস্তি বাড়ে। সে প্রায় প্রতি রাতে যায় বাগে—সজ্ঞানে নয়, ঘুমন্ত অবস্থায়। তার অন্তরের আহ্বান জানায় কুয়োর অন্তরীণদের। চৌকিদার তাকে বোঝায়, বাড়ি ফিরিয়ে দেয়। ওই ভাবেই চলছে এখন।

একটা যন্ত্রণাকাতর দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ে জমীদ সিংয়ের।

জমীদ সিংয়ের মুখে সব শুনে মনটা আমার ব্যথায় ভরে উঠলো।

আগ্রহভরে জানতে চাইলুম তোমার বিবিকে কিছু বুঝিয়ে বলে দেখেছো?

জমীদ সিংয়ের উত্তরে বেরিয়ে আসে হতাশার সুর—ঘটনা ঘটে যাবার পর বিবির কিছু মনে থাকে না। জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে শুধু।

কোনো চিকিৎসা করিয়েছো ?

ডাক্তার-বদ্যি-রোজা কিছু বাদ নেই। কিছুতেই কিছু হল না। একটা উদাস দৃষ্টি মেলে ধরে জমীদ সিং।

জমীদ সিংকে বললুম, মাঝে মাঝে দেখা কোরো! চিন্তা করে দেখি, কোনো উপায় পাওয়া যায় যদি। স্তোক-বাক্যই দিলুম তাকে নিরুপায় হয়ে।

মাস তিনেক বাদে জমীদ এসে হাজির।

কী খবর ?

ছেলে হয়েছে, নেমন্তন্ন।

মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। কই এখনো তো মনমরা ভাব যায়নি জমীদ সিংয়ের! জিজ্ঞেস করলুম, বিবির শরীর ভালো তো ?

জমীদ সিংয়ের নির্বিকার মুখে নির্লিপ্ত উত্তর—সেই আগেকার মত।

নেমন্তন্নে গেলুম। অনেক রাত হয়ে গেলো। সে রাতে রয়ে গেলুম ওদের বাড়িতে। জমীদ সিংয়ের বিবির সঙ্গে পরিচয়ে মুগ্ধ হলুম। সত্যিই এরকম মানুষ সচরাচর নজরে পড়ে না। এর সব ইতিহাস জানি বলেই অসহ্য, যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলুম। এদের কোনো সাহায্যেই লাগলুম না আমি, বন্ধুর একটুও উপকার করতে পারলুম না। জমীদ সিংয়ের বিবির কী সারবার কোনো উপায়ই নেই ? কেবল এই ভাবনা ঘুরে-ফিরে আসতে লাগলো। শুনলুম, এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দেশে নিয়ে গেলেও ওই অবস্থা। তবে এখানে রাত্তিরে বাগে আর ওখানে পথে। এই তফাত। মহা দুশ্চিন্তায় পড়লুম। ঘুমুতে পারলুম না। ছটফটানি বেড়ে গেলো। কী করা যায়, কী করা যায় মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো।

হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজে ধড়ফড় করে উঠে পড়লুম। জমীদ সিংয়ের বিবি বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা আচ্ছন্ন ভাব তার। বাচ্চাটা বিছানায় শুয়ে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলুম, যখনই বাচ্চা কাঁদে, তখনই জমীদ সিংয়ের

বিবির পা দুটো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার চলা শুরু হয়। আবার কান্না, আবার থামা। বড় অদ্ভুত ব্যাপার! অথচ বিবি যে এটা তার জ্ঞাতসারে করে চলেছে, তা মনে হল না। কেননা, সে বাচ্চার দিকে ফিরেও চাইছে না একবার।

আমার মাথায় চট করে একটা মতলব এসে গেলো। বাচ্চাটাকে হাতিয়ার করলে কেমন হয়? দেখা যাক না একটা চেষ্টা করেই। যেই ভাবা সেই কাজ। জমীদ সিংকে না জানিয়েই একটা কাণ্ড করে বসলুম। আমি একেবারে পড়ি-মরি করে একরকম লাফিয়েই বিবির সামনে এসে হাজির হলুম। তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। হাত দুটো ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলুম। একটা ধাক্কা খেয়ে যেন শিউরে উঠলো বিবি। চমক ভাঙলো। নিশ্চল পাথর-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়লো। বাচ্চাটাকে তার চোখের সামনে তুলে ধরে জোরে জোরে বলতে লাগলুম, চেয়ে দেখ দিকিনি ভাবী কে এসেছে! যাকে তুমি রোজ ডাকো, সে-ই কিনা? দেখো ভাবী, দেখো—তুমি আগে দেখোনি কেন?

বিবি চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাচ্চাটার মুখের দিকে অপলক চোখে কি দেখলো খানিক। আচমকা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে বাচ্চাটাকে। বুকে নিবিড় করে চেপে ধরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। পিছন ফিরতে দেখলুম, দূরে দাঁড়িয়ে জমীদ সিং দেখছে সব। এইভাবেই বোধ হয় তার বিবিকে সে নেপথ্য থেকে লক্ষ্য রাখতো রোজ।

জমীদ সিং কাছে এগিয়ে এলো। আমায় জড়িয়ে ধরলে। তার জলভরা চোখে একটা নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির আলো।

শেষ পর্যন্ত পাশ কাটানো গেল না। বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল মোটরটার। একটু আগেও কালো রঙের চকচকে মোটরটা দৌড়চ্ছিল প্রাণপণে। এক রকম আমাদের মোটরের সঙ্গে রেষারেষি করে। আমাদের গাড়িটার ওপর ও-গাড়িটার জাতক্রোধ হয়ে উঠেছিল যেন। ও-গাড়িতে প্রথমে উঠতে গিয়ে উঠিনি আমরা। আমরা বলতে আমি আর আমার খুড়তুতো ভাই।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দুজন পাঞ্জাবী যুবক কারটা নিয়ে আমাদের পাশে পাশেই চলছিল। ইলোরার গুহা দর্শনার্থী বোঝাই অন্য কার-বাসগুলোকে পিছনে ফেলে রেখে সদর্পে এগিয়ে গেল। অন্য গাড়ির চেয়ে ও-গাড়িটা মজবুত। নতুন রঙে রঙিন। গাড়িটার ড্রাইভার অন্য গাড়ির ড্রাইভারদের বিদ্রূপ করে বলেছিল, হুজুর! গাড়ি যেমন ড্রাইভারও তেমন। কত সাব ভাল সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে এই গরীবকে। এই গরীব পাথুরে রাস্তায় গাড়ি চালাতে উঁচুনীচু বাঁকের মুখে ঘোরাতে ওস্তাদ। জুড়ি নেই কেউ আর।

সত্যিই ড্রাইভার একটুও বাড়িয়ে বলেনি। তার গাড়ি চালানোর কায়দায় আর গতি বাড়ানোয় বুঝতে পেরেছিলুম আমরা।

কিন্তু এ হেন চালকও ঠিক মত চালাতে পারল না শেষ বাসটার সামনে এসে। বাসের ধাক্কা সামলাতে না পেরে উল্টে বেরিয়ে পড়ল রাস্তার এদিক-ওদিকে। গাড়িটা আগুন হয়ে জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে।

অন্য গাড়ির যাত্রীরা তুলল আহতদের। সেবাশুশ্রূষা করল সকলে মিলে। ভাগ্যক্রমে কারো গুরুতর আঘাত লাগেনি ওদের মধ্যে।

আমার চোখে চোখ পড়তে পাঞ্জাবী যুবক দুজন লজ্জায় মাথা নিচু করল। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় হাততালি দিয়ে

হেসে উঠেছিল একজন। আর একজন মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে বলেছিল, শাম তক আপ লোগ চলিয়ে। হমলোগ ওয়াপস আয়েঙ্গে তবভী চলেঙ্গে।

সন্ধ্যে অবধি আমরা চলতে থাকব—ওরা ফিরে আসবার পথেও দেখবে—আমরা চলছি। কথা যা বলেছে ছোকরা দেখছিও তাই। ভুল করলুম অন্যের কথা শুনে। গাড়ির যা মন্থরগতি হেঁটে যাওয়াই ভালো। নতুন গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভাঙা ঝরঝরে গাড়িতে উঠে কি আহম্মকি না করেছি।

ক্ষোভ হতে লাগল সরোজা আম্মার ওপর। উনি নিজেই গাড়িতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন প্রথমে। নিজের ডানপাশ বাঁপাশ দেখছিলেন বার বার। কাকে যেন দেখবার চেষ্টা করছিলেন। ওঁর ছেলে আর ছেলের বৌ পিছনে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। প্রথমে ভেবেছিলুম, ছেলে-বৌকেই খুঁজছেন বুঝি মহিলা। কিন্তু ওদের নির্বিকার অবস্থা দেখে বুঝলুম—ধারণাটা ঠিক নয়। তবে মহিলার এরকম আচরণে কৌতুক বোধ না করে আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

কারে উঠলেন না উনি। ছেলে-বৌকে নিয়ে অন্য কারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আগের মত দুপাশ দেখলেন ভালো করে। তারপর ছেলে-বৌকে উঠতে আদেশ দিয়ে, হাসিমুখে নিজে উঠলেন।

আমরাই ভাড়া নেব খালি গাড়িটা স্থির করলুম। উঠতে যাচ্ছি বারণ করলেন, জোড় হাতে অনুরোধ করে অন্য গাড়িতে যেতে বললেন মহিলা।

বারণের হেতু বুঝলুম না। ওঁর বারণ মানতে মন সায় দিচ্ছিল না যদিও, তবুও অনুরোধটা ঠেলে ফেলতে পারলুম না কিছুতেই। ভদ্রতায় বাধতে লাগল।

সরোজ আম্মার সঙ্গে আলাপ হয় আমার দৌলতাবাদে। দৌলতাবাদের ফোর্ট দেখতে গিয়ে। উনিও আমাদের মত দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। শুভ্রকেশী আম্মার রূপোলী চুল ফুরফুরে হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়ছে। যত মাথার কাপড় খসে খসে পড়তে চাইছে

উনি তত সামনের দিকে টেনে দিচ্ছেন। নিরাভরণা আম্মার সলজ্জ ভাবটায় আত্মসম্ভ্রম ফুটে উঠছিল। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল ওঁকে। এককালে বেশ সুশ্রীই ছিলেন উনি। চুয়ান্ন চললেও চুয়াল্লিশ মনে হয় নিটোল শরীর দেখে। কথা কইতে কইতে বয়সের কথাটা বলেছিলেন আম্মা।

তামিলনাদের মেয়ে উনি। শ্বশুরবাড়িও ঐখানেই। স্বামীকে হারিয়েছেন বছর পাঁচেক। স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন বেড়াতে এখানে। আজ এসেছেন ছেলের সঙ্গে আবার।

সরোজা আম্মা পাহাড়ঘেরা আঁধেরিফোর্টের অন্ধকার রাস্তার ইতিবৃত্ত বলে গেলেন অনর্গলভাবে। আগের বারে গাইডের মুখে শুনেছিলেন তিনি সব। এবারের গাইডকে কোনো কথা বলতেই দিলেন না। টর্চ জ্বেলে নির্বাক মুখে দাঁড়িয়ে রইল শুধু গাইড।

শত্রুপক্ষ পুল পেরিয়ে দুর্গের ব্ল্যাকআউট রোডে এসে পড়লে অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে যেত। দুদিকের দুটো পথ, একদিকে আগুন জ্বেলে রাখা হত। সেই সর্বগ্রাসী আগুনের হলকা থেকে বিপরীত দিকে পালাতে গেলে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে খাদের গভীর জলে পড়ে যাবে। মাঝখানে দাঁড়ালে ওপর থেকে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিয়ে মেরে ফেলবে শত্রুপক্ষকে দুর্গরক্ষী। অন্ধকারে শত্রুপক্ষকে নিঃশেষ করে ফেলবার জন্য ওপর-নীচে আশেপাশে আত্মগোপন করে জেগে পাহারা দিত রক্ষীরা। মরণবিষে ডোবানো লোহার কাঁটা ছড়িয়ে রাখত এই পথের সর্বত্র। পায়ে ফুটলে নির্ঘাৎ মৃত্যু শত্রুপক্ষের।

সরোজা আম্মার কথা বলবার কায়দা ইতিহাসকে জীবন্ত করে চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় একেবারে। ওঁর বলার সঙ্গে আমরা অতীতকে কাছে পেয়েছিলুম বেশ কিছুক্ষণ। সরোজ আম্মার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছলুম আমি।

কিন্তু সেই আম্মারই ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে যেতে। এখন কালো কারটা কালের মুখে পড়তে বুকটা কেঁপে উঠল আমার। উঠলে এই দুর্ঘটনায় পড়তে হত আমাদেরও।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আম্মার নিষেধ মেনে, খুব রক্ষে পেয়ে গেছি আমরা। কিছুক্ষণ আগের ক্ষোভবিরক্তি মন থেকে মুছে গেল মুহূর্তে!

শ্রদ্ধা এলো আম্মার ওপর। কিন্তু নানা প্রশ্ন তোলপাড় করতে লাগল ভিতরে। ভবিষ্যতের ঘটনা আগে থেকে কি করে জানলেন উনি! নিশ্চয় উনি জানতে পেরেছিলেন, তাই ও-গাড়িতে ওঠেননি। উঠতে দেননি। ড্রাইভারকেও মানা করেছিলেন এ সময়টা গাড়ি চালাতে। পাঞ্জাবী যুবক দুটিকেও উঠতে নিষেধ করেছিলেন। ওদের তিনজনের একজনও আম্মার কথায় কান দেয়নি। বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠেছিল তিনজনেই। পাঞ্জাবী যুবক দুটি কারণ জানবার জন্য জেদ ধরেছিল। আম্মার এক উত্তরই বেরিয়েছিল মুখ দিয়ে বার বার। ভালো মনে হচ্ছে না।

নতুন গাড়ি—ভালো মনে না হবার কি আছে? আপনার ভালো না লাগে আপনি যাবেন না। অন্যকে ভাঙাবেন কেন? রাগ করেই কথাগুলো বলেছিল ড্রাইভার।

যুবক দুটিকে ডেকে নিয়ে স্টার্ট করে দিয়েছিল মোটরটা।

বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল আম্মার মুখখানা। একটা বিপদের ছায়ায় ছেয়ে গেছল।

গাড়িটা দুর্ঘটনায় পড়তে আমাদের কার থেকে নেমে পড়েছিলুম যেমন আমরা, তেমনি আম্মাও নেমে পড়েছিলেন ওঁর কার থেকে। এগিয়ে গেছলুম ওঁর কাছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম। মনের প্রশ্ন বুঝেছিলেন হয়ত উনি। বলেছিলেন, এখানে এখন নয়। ইলোরার এক একটা গুহা দেখার সময় অনেক গল্প হবে। আপনার জানবার কৌতূহল মিটে যাবে'খন।

এর পর আর অন্য কথা চলে না। যে যার গাড়িতে ফিরে এসেছিলুম আমরা। এক এক করে সমস্ত গাড়ি-বাস চলতে শুরু করল আবার ইলোরার দিকে।...থামল গাড়িগুলো পাহাড়ের সামনে এসে। নামলুম আমরা। পাহাড়ের ধার কেটে রাস্তা চলেছে। ওপরে উঠলাম আমরা। ভিতরে গুহা। ইলোরায় তিনটি

ধর্মসম্প্রদায়ের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। বৌদ্ধ-হিন্দু-জৈন সম্প্রদায়ের গুহাগুলো যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে পাহাড়ে।

উনত্রিশ নম্বর গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে হল। ঝরনার জলের কাছে এগিয়ে গেলুম। ওপর থেকে নামছে ঝরনা। নীচে গভীর খাদে বয়ে চলেছে। নীচে থেকে সাদা ধোঁয়া উঠছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। জুড়িয়ে যাচ্ছে দু'চোখ। পাশে এসে দাঁড়ালেন সরোজা আম্মা। দৃশ্যটি দেখলেন খানিক। বসলেন। আমাকেও বসতে বললেন।

বসে আছি আমি। নিজের ডানপাশটায় একভাবে কি যেন দেখছেন আম্মা। আমার কিন্তু এরকম চুপচাপ বসে থাকা মোটেই ভালো লাগছে না। আম্মার দূরদৃষ্টির ব্যাপারটা জানবার আগ্রহ বেড়েই চলেছে। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হচ্ছে না। পাহাড়ে আসবার আগেই উনি নিজে জানিয়েছিলেন জানতে পারব সব। কিন্তু জানতে পারবার কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিনে। আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। না পারছি উঠে যেতে, না পারছি বসে থাকতে।

ধৈর্য পরীক্ষার অবসান হল আমার। ডানপাশ থেকে দৃষ্টি ফেরালেন সরোজা আম্মা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভবিষ্যৎ দেখার কোনো সাধনা জানা নেই আমার। ও সম্বন্ধে কিছু পড়িনি, শিখিনি।

ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলুম আম্মার ওপর! মনে মনে গজরাতে লাগলুম—স্পষ্ট বলে দিলেই তো হত—বলব না। এত ভূমিকা করবার কোনো মানেই হয় না। নমস্কার করে, ভদ্রতা বজায় রেখে উঠে পড়ব ভাবছি, বলতে শুরু করলেন আম্মা তাঁর দূরদৃষ্টির আদিকথা।

ভবিষ্যৎ দেখার ইতিহাসটা আমার অদ্ভুত ধরনের।

তখন আমি এগারো-বারো বছরের মেয়ে। দিনরাত দৌড়ঝাঁপ আর দুরন্তপনা করতে ভালবাসতুম খুব। ঘরবার—সকলেই উত্যক্ত হয়ে উঠত আমার দুষ্টুমির জ্বালায়। বাবা ছাড়া কেউই দুচক্ষে দেখতে

পারত না আমায়। বাবা বলতেন সকলকে—এই মেয়ে দেখবে বড় হলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মা মন্তব্য করতেন—আর একটু আস্কারা দিলে মেয়ে যে একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুন হবে তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। মায়ের কথায় হেসে উঠত বাড়ির সকলে। আমি আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করতুম, সব শুনতুম। বাবার হেনস্তায় কান্না আসত। দুষ্টুমি করব না প্রতিজ্ঞা করতুম—কিন্তু দুষ্টুমি না করে থাকতে পারতুম না কোনোদিন কিছুতেই।

শত চেষ্টা করে যে দুষ্টুমি বন্ধ করতে পারিনি আমি কোনোদিন, সেই দুষ্টুমি বন্ধ হয়ে গেল আপনা হতেই। বাবার জন্যই। অসুস্থ হয়ে পড়লেন বাবা। সিরোসিস অফ লিভারের অসুখে মরণাপন্ন হয়ে পড়লেন। ডাক্তার-বৈদ্যরা জীবনের আশা ত্যাগ করলেন। বাবার জন্য ঠাকুর ঘরে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছিলেন মা। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছল একেবারে মায়ের। মুখের দিকে তাকালেন জলভরা চোখ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ত না আমার। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করে কেঁদে বুক ভাসাতুম। জোড়হাত করে বলতুম, ঠাকুর বাবাকে বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেল। দরজায় ঘা পড়ত। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম নিজেকে সামলে নেবার জন্য। কাজল ধোয়া চোখে কাজল পরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতুম। যে এলো—তার কাছে আত্মগোপন করে বলতুম—সাজছিলুম। পিছন ফিরে তাকিয়েই দৌড়ে পালিয়ে যেতুম সেখান থেকে।

এইভাবেই চলেছিল আমার কিছুদিন অবধি।

ডাক্তারেরা ঘোষণা করলেন—সামনের অমাবস্যার টালটা আর সামলাতে পারবেন না বাবা। কথাটা শোনবার পর যেন কেমন হয়ে গেলুম আমি। বুকফাটা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। পারছে না। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, বাবা মরতে পারবে না। মরবে না, মরবে না। পারলুম না চীৎকার করে কোন কথা বলতে। গলাটা যেন শক্ত হাতে চেপে ধরেছে কে। দমবন্ধ হয়ে আসবে বুঝি আমার এখুনি। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না আমি।

নিজের অগোচরেই চলে এলুম আমি বাবার ঘরের দরজার সামনে। বাবার চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে আত্মীয়-স্বজনেরা। সকলেই নির্বাক। কেবল কুলপুরোহিত কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে মৃদুস্বরে বলে চলেছেন ইষ্টনাম।

বাবার মাথার দিকে তাকাতেই হতভম্ব হয়ে গেলুম আমি। আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখানে। নিজের দিকে তাকালুম। দরজার সামনে আগের মতই ঠিক দাঁড়িয়ে আছি। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বাবার মাথার কাছে আয়না নেই। তবে ও কে—হুবহু আমারই মত? দু-দিক দেখতে দেখতে নিজেকে ভুলে যেতে লাগলুম আমি। কখন যে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিলুম জানিনে। কখন যে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলুম তাও মনে নেই।

জ্ঞান হয়ে দেখেছিলুম—মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। মায়ের মুখেই শুনেছিলুম—বাবা ভালো আছেন। ভেবেছিলুম—সান্ত্বনা। বাবার কাছে গিয়ে দেখেছিলুম সত্যি ভালো। হেসে হাত নেড়ে বসিয়েছিলেন আমায়।

বাবার সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন ক্রমে। কিন্তু আশ্চর্য! অমাবস্যায় আমার দ্বিতীয় রূপ দেখার পর থেকে আমি যেন সর্বক্ষণের সঙ্গিনী পেয়েছিলুম একজনকে। সে আমার দ্বিতীয় রূপ। আমি চলেছি, সে চলেছে আমার পাশে পাশে—বেশ অনুভব করছি। আমি বসছি উঠছি শুচ্ছি—সেও সঙ্গে সঙ্গে বসছে উঠছে শুচ্ছে। এসব কথা আমি বলেছি অনেককে। কেউ বিশ্বাস করেনি। করতে চায়নি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

মনের ভুল ভেবে ভুলতে চেষ্টা করেছি আমার সঙ্গিনীকে। সঙ্গিনী কিন্তু ভুলতে দেয়নি তাকে এক মুহূর্তের জন্যও। সদাসর্বদা আমাকে আগলে আগলে রাখত যেন।

তখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। সেটা উনিশ শো আটাশ সনের কথা। শ্রীনারায়ণ গুরু স্বামী মারা গেছেন সবে। ওঁর আদর্শ আমি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলুম। সব মানুষেরই এক জাত এক ধর্ম এক

ঈশ্বর। ওঁর উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছিল। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ সকল জাতের মন্দিরের প্রবেশের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে আইন পাশও হয়েছিল।

আমাদের গ্রামে প্রাচীনপন্থী—আর নবীনপন্থী—দুটো দল গড়ে উঠল। নবীনপন্থীদের দলে প্রাচীনপন্থীদের আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম স্বামী-স্ত্রীতে আমরা। আমাদের চেষ্টায় বাধা দিয়েছিলেন নানা রকমে প্রাচীনপন্থীরা। তাঁরা জাত বিচার তুলে দেবার নামে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অজাত-কুজাতদের মন্দিরের ধারে-কাছে আসতে দেবেন না প্রাণ থাকতে। কার্ডেমম পাহাড়ের দুর্ধর্ষ উরলিদের দিয়ে আমাদের শেষ করতেও চেয়েছিলেন।

উরলিরা যখন আমাদের বাড়ি ফেরার পথে সুযোগ-সুবিধে বুঝে, চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছিল একদিন, মাথার ওপর জোড়া জোড়া হাতে ছোরা উঁচিয়ে ধরেছিল—অসহায় অবস্থায় চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিলুম। সাহায্য করবার মত কাউকে ধারে কাছে দেখিনি। কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলুম আমার সঙ্গিনীকে। যে পাশে ফিরেছি সেই পাশেই দেখেছি। একা সে বহু হয়ে গেছল যেন সেদিন।

হঠাৎ আমরা বেপরোয়া ভাব এলো একটা। স্বামীর হাত ধরে, ওদের ভ্রূক্ষেপ না করেই চলতে লাগলুম। মন্ত্রের মত কাজ হল। আস্তে আস্তে সরে গেল ওরা নির্বিবাদে।

বিপন্মুক্ত হলুম আমরা। শেষ হতে হতে রয়ে গেলুম। বিস্ময়ের অন্ত ছিল না আমাদের সেদিন।

আমার সঙ্গিনীর আগলানো ছাড়াও আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি আমি বিশেষভাবে। আমার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেও সময় সময়। এই সময়টায় বিপন্মুক্ত হতে পারিনি আমি কোনো-রকমে। স্বামীর সামান্য অসুখে আমি দেখতে পাইনি সঙ্গিনীকে। অনেক চেষ্টা করেছিলুম। পাশে এসে দাঁড়ায়নি। যত দিন যাচ্ছিল তত অজানা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ছিল আমার ভিতরটা।

ডাক্তাররা বলেছিলেন—ভয়ের কোনো কারণ নেই। ঠাণ্ডা লেগে

অনেক সময় ওরকম সামান্য ঘা হয়েই থাকে অনেকের জিভে।

একলা ঘরে বসে পাগলের মত ডেকেছি কতদিন সঙ্গিনীকে। নি ইংগে ওয়া, নি ইয়ে ওয়ারামাটে! তুমি এসো, কেন তুমি আসছো না!

আমার এত ডাকা সত্ত্বেও শুনতে পায়নি সঙ্গিনী। সামান্য ঘা-ই ক্যান্সার হয়ে দাঁড়াল শেষ অবধি। ছেড়ে চলে গেলেন উনি আমায়।

এর পরে না ডাকতেই এসেছে সঙ্গিনী আবার আমার পাশে। আবার সরেও গেছে সময় সময়—বিপদের সংকেত জানাবার জন্য।

একটু থেমে বললেন সরোজা আম্মা—আজকেও ঐ মোটরটায় ওঠবার সময় দেখতে পেলুম না সঙ্গিনীকে। ডানপাশেও না। বাঁপাশেও না। সরে গেছল তখন ও।

রুদ্ধনিশ্বাসে এতক্ষণ ধরে শুনছিলুম আমি সরোজা আম্মার মুখে ওঁর দূরদৃষ্টির গোপন কথা। দু'চোখ ঘুরছে আমার ওঁর ডানপাশে বাঁপাশে।

শিশুর হাসি ছড়িয়ে পড়ল সরোজা আম্মার মুখখানায়। উনি বললেন, কি দেখছেন? সঙ্গিনীকে? আছে আমার পাশেই। আমি ছাড়া ওকে আর কেউ দেখতে পায়নি আজ পর্যন্ত।

তাঁবু খাটানো শেষ হয়নি তখনো। উত্তর দিকটা বাকি। বীরদেও এসে হাজির হলেন। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলুম ওঁকে। বলিষ্ঠ চেহারার লোক। রঙটা তামাটে হয়ে গেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে দেখে। মরুভূমির তাপ সয়ে সয়ে রঙের জেল্লা মরেছে। কিন্তু মুখখানার কোথাও রুক্ষতার ছাপ পর্যন্ত নেই একটু বরং বিপরীতটাই দেখলুম। মিষ্টি মুখখানায় হাসির ঢল নেমেছে। ভাসাভাসা স্নিগ্ধ চোখ দেখে মনে হয় না নীরস মানুষ। মাথায় পাগড়ি পায়ে নাগরা পরনে চোস্ত পাজামা আর আচকান।

সব মিলিয়ে প্রথম দর্শনে—পরিচয়পর্বের আগেই মনে মনে ভালো লেগে গেছল আমার। যৌবন যাই যাই করেও যায়নি ওঁর শরীর ছেড়ে। প্রৌঢ়ত্বের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলুম না ওঁর ভিতর। চলনে বলনে সবেতে একেবারে তরতাজা। ওঁর মুখের 'ভাই' সম্বোধনটা দাগ কেটে বসে গেছল মনে।

উত্তর দিকটা আর এগুতে বারণ করেছিলেন উনি। বেশ গম্ভীর গলায় জানিয়েছিলেন, ওদিকটায় গেলে অবধারিত সর্বনাশ। যে যায় সে আর ফেরে না। সকলেই যে ফেরে না—একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ফেরে হয়তো কেউ কেউ। কেননা জনাতিনেক লোককে ফিরতে দেখেছেন উনি। ওদিকের মৃত্যুগহ্বর থেকে কি করে যে ফিরে এলো ওরা—এর কূলতল খুঁজে বার করতে পারেনি কেউ। এক একজনের ধারণার ওপর এক একটা গুজব কাহিনী রটেছে মাত্র।

কিছুদূরে একটা তিনতলা বেলে পাথরের বাড়ি দেখিয়ে বলেছিলেন বীরদেও, যখুনি কোনো প্রয়োজন হবে—নিজের মোকাম

ভেবে চলে আসবেন ওখানে। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলেছিলেন কথা-গুলো বীরদেও।

নজর পড়েছিল আমার পাথরের জাফরিঘেরা বারান্দার দিকে। কাউকে সরে যেতে দেখেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বীরদেও চলে গেছলেন বাড়িটার দিকে।

নিষিদ্ধ প্রাচীর ভেঙে তছনছ করবার ইচ্ছে মানুষের বরাবরের। পায়ে পায়ে এগুতে লাগলুম আমি। উত্তর দিকটা টানতে লাগল আমায় যেন। মৃত্যুগহ্বরটা কি--জানবার জন্য উৎসুক মন অস্থির হয়ে উঠল।

চতুর্দিকে বালি আর বালি। উঁচু-নীচু পাথুরে রাস্তায় বালির আস্তরণের পর আস্তরণ। দূরে দূরে বাবলা-শমি আর কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে পা ডুবে যাচ্ছে বালির ভিতর। সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাওল জয়মলের তৈরী শহর দুর্গ। পাহাড়ের ওপর পাহাড় ঘেরা পাথরের দেয়াল ঘেরা জয়মলের শহর। আটশো বছর আগের লোকে লোকারণ্য শহর আজ জনহীন হতে বসেছে। থর মরুভূমির করাল গ্রাসে শ্মশান হতে চলেছে। মরুর বুকের কান্না যেন আমার বুকে ডুকরে উঠল।

দাঁড়ালুম খানিক। এগুতে যাচ্ছি · অবাক হয়ে গেলুম বীরদেওকে দেখে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, অনুরোধ করলুম···শুনলেন না কেন? বিশ্বাস হল না আমার কথা? বলে হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বালির পাহাড়ের কোলে। আশ্চর্য! জায়গাটায় যেন একটা বালির ঘুর্ণি দেখলুম। চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল লাঠিটা।

ওদিকে গেলে সত্যিই কোথায় তলিয়ে যেতুম—কেউ জানতে পারত না কখনো।

নানা দেশে ঘুরেছি। কিন্তু এরকম অজানা বিপদের আওতায় পড়তে হয়নি এর আগে কোথাও। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলুম বীরদেওর জন্য। ধন্যবাদ জানালুম। কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে

এলো আমার।

তাকালেন বীরদেও জাফরিকাটা বারান্দাওলা বাড়িটার দিকে। তাকালুম আমিও। জাফরির পিছনে ধীরস্থির পাথরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন কে। বীরদেও নিজেই বললেন, বারান্দায় আমার মা দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে ডেকেছেন। সময় পেলে যাবেন। উনিই ওপর থেকে আপনার সব লক্ষ্য রাখছিলেন। দু-দুবার মা-ই পাঠিয়েছেন।

অন্যের সন্তানকে বাঁচাবার এত আগ্রহ যাঁর, যাঁর অন্তরে এত মমতা—তাঁর কাছে আমার এখুনিই যাওয়া উচিত। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই বীরদেওকে নিয়ে মাতৃদর্শনে গেলুম। বিদেশ হলেও স্বদেশের মায়ের মতোই আদর আপ্যায়ন পেয়েছিলুম ওঁর কাছে। আমার ওপর অযাচিত মাতৃস্নেহ ঢেলে দেবার কারণ খুঁজে পেতে দেরী হয়নি বেশীক্ষণ। ভিতরের চাপা দুঃখ চেপে রাখতে পারেননি মহিলা। মুহূর্তের মধ্যে আমাকে আপনার করে নিয়েছিলেন। তাই কথায় কথায় মনের কথা বলে ফেলেছিলেন।—বড়ছেলে বেঁচে থাকলে আজ তোমারই বয়সী হত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম তোমায় আর ভাবছিলুম তার কথা।

তখন বছর পাঁচেকের সে। দামাল ছেলে। সবার চোখে ধুলো দিয়ে কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। খোঁজ যখন পড়ল, তাকে যখন দেখতে পাওয়া গেল, তখন সে সকলের নাগালের বাইরে। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি সবে। চোখের সামনে দেখলুম। যে দিকটায় যাচ্ছিলে তুমি······ঠিক ওই জায়গাতেই—

মহিলার গলা ধরে এলো। আর কিছু বলতে পারলেন না। ওড়না দিয়ে ঢেকে দিলেন জলভরা দু চোখ।

কিছুক্ষণ। নিস্তব্ধ নিঝুম ঘরে বসে বসে কল্পনার চোখে দেখতে লাগলুম আমি এক ব্যথাকাতর মায়ের ছবি। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভাঙল ঘরের। উনি বললেন, একবার করে এসো রোজ।

পুত্রশোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বীরদেওর মাকে আমি মা বলেই

ডাকতুম। খুব খুশি হতেন উনি। বীরদেওদের বাড়িতে যাতায়াত করতুম আমি রোজই।

এই যাওয়া আসার মধ্যেই আমার ধর্ম-মা—ওই মহিলা, অর্থাৎ রাজেশ্বরী বাঈ-এর অদ্ভুত জীবনকাহিনী জানতে পেরেছিলুম। একদিন ওবাড়ির পুরনো ঝি—রাজেশ্বরী বাঈ-এর অপদ-বিপদের একমাত্র সঙ্গিনী সরমীভীলনী শুনিয়েছিলো সমস্ত কথা। তাঁর কথাতেই বলি ঃ

"—হোলির দিন ছোটসায়েব এলেন এবাড়িতে। ছোটসায়েব রণজলালজী মালিক সন্তজয়ভরাজজীর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিভাই। ছোটসায়েবকে দেখে, মালকিন রাজেশ্বরী বাঈজী চমকে উঠলেন। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। একটা অজানা ত্রাস ঘিরে ধরল ওঁকে। মনের জোর করতে চেষ্টা করেছেন, ভয় সরাতে চেষ্টা করেছেন। পারেননি। শেষে মালিককে, না বলে পারেননি। মালিককে বলেছিলেন মালকিন আমি ওঁকে দেখেছি। দেখেছি আমার আট বছর বয়েসের সময়।

তখন সন্ধ্যে হব হব। শরীরটা ভালো ছিল না বলে শুয়েছিলুম চুপচাপ। ঘুম আসছিল চোখে। হঠাৎ চোখ চাইতেই ভীষণ ভয় পেয়ে উঠলুম। আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একজন। অচেনা-অজানা লোক। চোখ দুটোর দিকে তাকাতে পারছিলুম না। তখন যাকে দেখেছিলুম—ভুলে গেছলুম পরে। প্রথম দেখাটা তন্দ্রাঘোরে—চোখের পলক পড়তে না পড়তে মানুষটা মিলিয়ে গেছল। কিছুদিন বাদে মন থেকেও মিলিয়ে গেছল। ইনি একেবারে সেই লোক। সেই নাক সেই মুখ সেই চোখ। কোনো কিছুর তফাত নেই একটুও।

সব শুনে হেসে উঠেছিলেন মালিক। বলেছিলেন, তুমি বড় বেশি কল্পনা করো। সবকথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন হোলির গান গেয়ে। 'হোলি আই সায়েবা রংগ কর। হোলি এলো। প্রিয়া রঙ খেল, আনন্দ কর।' হাত ধরে হিড় হিড় করে তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন মালিক ছোটসায়েবের সামনে।

হোলির দিনে কোনো বাছবিচার রাখে না রাজপুতরা। বছরের

এই একটা দিনে মা-বাপ ভাইবোন বন্ধু-বান্ধব স্বামী-স্ত্রী-সকলে একসঙ্গে হোলি খেলে।

চলছে হোলি খেলা। আবিরফাগের ছড়াছড়ি। পিচকিরীর রঙে ঘাগরা-ওড়না রঙিন হয়ে উঠেছে। মালকিনের মুখখানায় একরকম জোর করেই আবির মাখিয়ে দিলেন ছোটসায়েব! থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সর্বশরীর মালকিনের। মাখানোর ধরনটা জঘন্য রকমের মনে হল।

হোলি কেটে যাবার পরও ছোটসায়েব ফিরলেন না তাঁর দেশে। রয়ে গেলেন। এখান থেকেই ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধে হবে। তাছাড়া জায়গাটার জলহাওয়া শরীরের সঙ্গে খুব খাপ খায়।

ছোটসায়েবের থেকে যাওয়ায় মহাখুশি মালিক। কিন্তু রাজেশ্বরী বাঈ মুষড়ে পড়লেন খুব। আকাশ ভেঙে পড়ল ওঁর মাথায়।

কেন জানেন না একটা অশুভ আশঙ্কা মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল সর্বক্ষণ। আরো বেশী করে ভয় ধরত ওঁর—যখন ভিতরের জাফরিকাটা বারান্দার আড়ালে যাতায়াত করতেন। এঘর থেকে ওঘরে যেতেন। জাফরির ফাঁকে লক্ষ্য পড়লে—নীচের মানুষকে দেখেছেন। চত্বরে বসে আছেন ছোটসায়েব। দৃষ্টি তাঁর ঊর্ধ্বে। মালকিনের ওপর। এতে খুব অস্বস্তি বোধ করতেন মালকিন। এ ঘটনা ঘটত রোজই। রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত।

মালকিন জানিয়েছিলেন মালিককে সমস্ত। কথায় কান দেননি মালিক। বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ওপরের দোষ ধরবার আগে নিজের মন পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা কর।

এর পর অনেকবার অনেক রকম অসভ্য আচরণ দেখেছেন মালকিন, কাউকে কোনো কথা বলেননি আর। কারো বিরুদ্ধে কারো কাছে কোনো অভিযোগ করেননি একবারের জন্যও।

এইভাবে ঘুরে এলো একটা দুঃস্বপ্নের বছর। নতুন বছরটায় যে একটা ভয়ঙ্কর দিন অপেক্ষা করছিল – ওৎ পেতে বসেছিল মালকিনের জন্য—আগে কেউ বোঝেনি। বুঝতে পেরেছিলেন মালকিন।

বাসন্তী রঙের পোশাক পরে শিকারে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন মালিক। পাগলের মতো ছুটে এসে সামনে দাঁড়ালেন মালকিন। শিকারে যেতে দেবেন না উনি কিছুতেই।

রাজপুতদের বসন্তকালের আহেরিয়া উৎসবে—শিকার উৎসবে সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করাই রীতি। সব জেনেশুনেও বারণ করলেন মালকিন, মত্ জাইয়ে—।

জাফরির ফাঁক দিয়ে দেখেছি আমি ছোটসায়েবের রক্তজবা চোখ। আরো দেখেছি, শিকারের দিকে লক্ষ্য নেই মোটে ওঁর। আপনাকে লক্ষ্য করেই ছুটে চলেছেন পিছু পিছু। হাপুসনয়নে কেঁদে ভাসিয়েছেন মালকিন। —মত জাইয়ে!

মালকিনের ওপর ভীষণ রেগে গেছলেন প্রথমে মালিক। চোখের জলে মন গলেছিল শেষে। মৃদু হেসে ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলেন, পাগলী কোথাকার! উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা কোত্থেকে মাথায় এসে জট বাঁধে তোমার বুঝতে পারিনে। ওসব ছেড়ে দিয়ে কানাইলালজীর ধ্যান কর—শান্তি পাবে। আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেছলেন সেখান থেকে।

মালকিন অপলক চোখে তাকিয়েছিলেন। যতদূর দেখা যায় দেখেছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মালিক ছোটসায়েব হাত ধরাধরি করে চলেছেন দুজনে। চোখের বাইরে চলে যাচ্ছেন ওঁরা। মিলিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। মিলিয়ে গেলেন।

স্বামীর আদেশ পালন করেছিলেন মালকিন। ঠাকুরঘরে গিয়ে কানাইলালজীর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। অশান্ত মন শান্ত করতে চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে। পারেননি। এইভাবে কেটেছে অনেকক্ষণ। কতক্ষণ বলতে পারা যায় না। হঠাৎ ওঁর মনে হল পাথরের ঠাকুর জীবন্ত হয়ে উঠছে যেন, চোখ দুটো নড়ছে। চোখের তারায় ভেসে উঠছে মালিক আর ছোটসায়েবের ছবি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মালকিন। মালিক পাহাড়ের উঁচু দিকটায় দাঁড়িয়ে। নীচের দিকটায় কি যেন দেখছেন। হয়ত শিকার খুঁজছে ওঁর দু চোখ। পিছনে এসে

দাঁড়ালেন ছোটসায়েব। চোখের পলকে কি যে হয়ে গেল বুঝে উঠতে পারলেন না প্রথমে মালকিন। মালকিন দেখলেন, মালিক ওপর থেকে পড়ে গেলেন নীচে—আরো নীচে—অনেক নীচে। চোখে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মালকিন।

শিকার করতে গিয়ে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসেননি আর মালিক। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন ছোটসায়েব। অল্প-কথায় জানিয়েছিলেন মালিকের মৃত্যুর কারণ। শিকার করতে গিয়ে, অসাবধানে উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে মাথায় দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। বেহুঁশ হয়ে গেছলেন সঙ্গে সঙ্গে। হুঁশ হয়নি আর।

একথা মেনে নেননি মালকিন। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, পিছন থেকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ওঁকে। চমকে উঠেছিলেন ছোটসায়েব। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন, বড়সায়েবের শোকে ভাবীজীর মাথার ঠিক নেই। কে ঠেলবে, কেন ঠেলবে? মাটির মানুষ বড়সায়েব। ওঁর শত্রু ছিল না তো কেউ? বড়সায়েবের মৃত্যুটা ভাবীজীর মতো সকলেরই প্রাণে লেগেছে।

সকলেই স্বীকার করেছিল—অকাট্য যুক্তি ছোটসায়েবের।

এর পর থেকে এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন মালকিন। জ্ঞাতিস্বজনের অনুরোধে যেতে গিয়েও পারেন নি। কিন্তু সকলের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে নিশুতি রাতে পালাতে হয়েছিল মালকিনকে একদিন। ছোটসায়েবের হাত থেকে বীরদেওকে বাঁচাবার জন্য, নিজে বাঁচবার জন্য পালানো ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না আর ওঁর।

বীরদেওকে আদর করার ধুম দিন দিন বেড়ে উঠছিল ছোটসায়েবের। মালকিনের এটা ভালো লাগত না। বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠত। ছেলেটাকে হারাই হারাই মনে হত। মনে হত যেন ছোটসায়েব সাক্ষাৎ কাল। মানুষের মূর্তি ধরে এসে এ সংসারে ঢুকেছে সকলকে গ্রাস করবে বলে। স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে লোকটা। ছেলেকেও না নেয় শেষে। পাঁচ বছরের বীরদেওকে চোখে চোখে রাখতেন

মালকিন। ছোট সায়েবের কাছে যাবার নাম শুনলে বুকে চেপে ধরে রাখতেন। সরল শিশু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত ফ্যাল ফ্যাল করে।

ছোটসায়েবের প্রস্তাবটা প্রথম শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছলেন মালকিন। মুখ দিয়ে কোনো কথা সরেনি খানিকক্ষণ। খালি ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে অঝোর ঝরে কেঁদেছেন। কেমন করে বলতে পারে মানুষ এই কথা মুখ দিয়ে। সবে মাস ছয়েক চলে গেছে মানুষটা। এর মধ্যেই বিয়ের প্রস্তাব! লাতরায়ত রাজপুত সমাজে বিধবা বিয়ের চলন আছে ঠিক কথা—তা বলে ভিতরের চাপা ইচ্ছেটাকে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো এইভাবে প্রকাশ করে নাকি কোনো মানুষ।

কি করবেন—কোথায় যাবেন—চিন্তায় চিন্তায় চোখের-পাতা এক করতে পারেন না মালকিন দিনেরাতে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে দেরীর বিপদ ঘনিয়ে আসবে আগে। প্রস্তাব মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন মালকিন।

পণ্ডিত দিয়ে প্রথম বিয়ের দিনটাই ঠিক করে ফেললেন ছোট-সায়েব। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো! শুভস্য শীঘ্রম। আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলেন ছোটসায়েব। সরাবের নেশায় মত্ত হয়ে রইলেন দিবারাত্র।

পাঁচ-ছয়দিন বাকি বিয়ের। রাতদুপুরে চারপাই ছেড়ে উঠে গেলেন ছেলের চারপাই-এর কাছে মালকিন। ঘুমন্ত ছেলের কপালে চুমু খেলেন। বুকে তুলে নিলেন। আগে থেকেই ঘরের দরজার গোড়ায় অপেক্ষা করতে বলে রেখেছিলেন আমায়। দরজা খুলে বেরুলেন। ইশারায় কালো চাদরটা ঢেকে দিতে বললেন ওঁর সর্বশরীরে। মাথা পেতে নিলুম আমি ওঁর আদেশ। আমিও একটা কালো চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে নিলুম। অন্ধকারে চলার সুবিধে হবে।

সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলতে লাগলুম আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে। অতি সন্তর্পণে মহলের পর মহল পেরিয়ে বাইরে এলুম। বাড়ির

বাইরে বেরুতে মালিকের অনুগত মহলের বিশ্বাসী কজন লোক খুব সাহায্য করেছে আমাদের চতুর্দিক ঘিরে রেখে। মালকিনের দ্বিতীয় বিয়ে মনেপ্রাণে চায়নি ওরা।

রাত্তিরে বড় একটা পথে বেরোয় না কেউ। জনশূন্য। পথে চলেছি আমরা। কেবল মনে হচ্ছে – দূর থেকে কার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে। পিছন ফিরে তাকাতেই বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। সন্দেহ মিথ্যে নয়। বাবলা গাছটার আড়ালে কে যেন সরে গেল। মালকিনকে সতর্ক করে দিলুম হাত টিপে। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছি আমরা। জেগে উঠল বীরদেও। কখনো আমি বুকে নিয়ে চলেছি বীরদেওকে, কখনো মালকিন।

কোথাও কোনো গাছপালা পাচ্ছি না যে লুকোতে পারি আমরা। গাছপালা ছাড়িয়ে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি—বালির পাহাড় আর টিলা ছাড়া কিছু নেই। টিলার পিছনে শুয়ে পড়ে লুকবো স্থির করলুম। এগুচ্ছি। দেখতে পেলুম, লোকটা এগিয়ে আসছে বড় বড় পা ফেলে। যেন সাক্ষাৎ ঝড় এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। লুকনো হল না। কিন্তু উঁচুনীচু রাস্তায় চলতে বেশ কষ্ট হতে লাগল এবার। রাস্তার ওপারে বাড়ি, এপারে আমরা। একটুখানি পথ এসেছি সবে। কিন্তু মনে হচ্ছে অনেকখানি। ভারী হয়ে উঠছে পা। বালির রাস্তায় বসে যাচ্ছে। আটকে যাচ্ছে।

• মরুভূমিতে যেন বাজপড়ার আওয়াজ শুনলুম। ছোটসায়েবের আওয়াজ।—পালাতে চেষ্টা করলে রেহাই পাবে না কেউ। বুঝতে পারলুম, পিছু নিয়েছিলেন ছোটসায়েব আমাদের। রাতের অন্ধকারেও মালকিনকে পাহারা দিত ওঁর দুচোখ।

পিছনে ছোটসায়েব। এদিকে এগুতে চেষ্টা করেও, এগুতে পারছিনে আমরা এক পাও। হঠাৎ মরুর বুকে ঝড় উঠতে দেখে প্রমাদ গুনলুম। বিধি বাম নিশ্চয়। তা না হলে এমন সময় ঝড় এলো কোত্থেকে। ঝোড়ো হাওয়া সজোরে ঠেলছে আমাদের পিছনে। ছোটসায়েবের দিকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম আমরা। তিনজনের বুকের আওয়াজ

শতজনের হয়ে বেজে উঠছে কানে। বালির ভিতরই মাথামুখ গুঁজে রয়েছি একভাবে। দুর্যোগের চেয়ে দুর্ভাবনাটাই বেশী করে পেয়ে বসছে। ছোটসায়েবের নাগালের বাইরে যেতে পারলুম না আমরা। নিরুপায় অবস্থা আমাদের। সাহায্যের কেউ নেই ধারে-কাছে। ছোটসায়েব নিশ্চয় আমাদেরই মতো শুয়ে আছেন ওদিকে। ঝড় একটু থামলে এদিকে আসবেন। লাঞ্ছনার একশেষ হতে হবে ওঁর হাতে। জামার তলায় লুকানো ছোরাটায় হাত বুলিয়ে নিলুম বার-দুয়েক। আত্মরক্ষার শেষ সম্বল। জানি ছোটসায়েবের মনে হবে ওঁর শক্তির কাছে অতি এটা তুচ্ছ জিনিস। তবুও কিছুক্ষণ যুঝতে পারবো হয়ত। অনন্ত বাড়ির কাছাকাছি এলাকা থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে পারব হয়ত। শক্ত মুঠোয় চেপে রইলুম ছোরাটাকে।

ঝড় থামল। আকাশ বাতাসের বালি থিতিয়ে পড়তে লাগল পাথুরে জমির ওপর। ধড়মড় করে উঠে বসলুম আমরা। পালাবার পালা এবার। এক মুহূর্ত নষ্ট হলে মহা অনর্থ ঘটে যেতে পারে।

পালাতে গিয়েও পারলুম না আমরা। নতুন করে আর একটা বিপদ উপস্থিত হল। হতাশ হয়ে পড়লুম। এ বিপদের কবল থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব আমাদের পক্ষে।

আশ্চর্য হয়ে দেখছি আমরা। সামনের জমির খানিকটা ঘুরছে। ঘুরেই চলেছে। ঘুরতে ঘুরতে জায়গাটা নেমে যাচ্ছে ক্রমে নীচের দিকে। ওখানকার ঘূর্ণিবাতাস টানছে আমাদের। টানছে বালির পাহাড়ের কোলে—মৃত্যুগহ্বরের অতল তলে তলিয়ে দেবার জন্য।

এইখানেই একদিন হারিয়ে গেছল···তলিয়ে গেছল বড়ছেলেটা! ভেজা গলায় বললেন মালকিন। ছোটসায়েবের হাতে পড়ার চেয়ে··· এখানে মলে···আমাদের পুণ্যলাভ হবে।

আমরা মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এগুচ্ছি।

ঘূর্ণিবাতাসের টানে ওধার থেকে ছোটসায়েবও এগিয়ে আসছেন। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বাঁচবার জন্য যুদ্ধ করে চলেছেন। ওঁর

পিছু হটবার প্রবল চেষ্টা দেখে, মনে হচ্ছে তাই। কয়েক মুহূর্ত। একটা দমকা বাতাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়লুম আমরা পুবদিকের টিলার কাছটায়। ঘূর্ণিবাতাসের আকর্ষণ থেকে বেঁচে গেলুম আমরা অদ্ভুতভাবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ছোটসায়েবের অন্তর্ভেদী আর্তনাদ শুনতে পেলুম।—বচাও! বচাও!

ক্ষীণ হতে হতে নীরব হয়ে গেল ছোটসায়েবের কণ্ঠস্বর।”

কেদার যাবার পথ।

কুণ্ডাবাজার। পি. ডবলু. ডি.-র কোয়ার্টারগুলোর সামনে আকস্মিকভাবে রামশরণের সঙ্গে দেখা। ওকে ওখানে দেখতে পাবো কল্পনাও করিনি। বিস্ময়-আনন্দ দুটোই অনুভব করলুম। রামশরণ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে, ফেরার পথে তার কোয়ার্টারে আসতেই হবে।

রামশরণের বদলির চাকরি। মাসখানেকের মেয়াদ। আগেকার ওভারসীয়ার অঞ্জন ছুটিতে। তার মা'র খুব অসুখ। কদিন এসে অবধি ভালো লাগছে না রামশরণের। আত্মীয়-স্বজন থেকে বহু দূরে। বড্ড একলা একলা। তাই অনুরোধ···।

বাল্যসাথী-সহপাঠী রামশরণকে কথা দিলুম, যদি বেঁচে ফিরি, যদি পথে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহলে নিশ্চয়ই আসবো আবার।

পি. ডবলু. ডি.-র কোয়ার্টারগুলো বেশ মনোরম পরিবেশে। দু'-পাশে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই। মাঝখানে মন্দাকিনীর কাকচোখ জলের খরস্রোত। তার ওপর এপার ওপারের সংযোগ রেখেছে একটি পুল। দূরে দূরে হর্তুকি, রুদ্রাক্ষ গাছের বাহার। পাহাড়ী ফুলের সরগরম জায়গায় জায়গায়—লাল-নীল-হলদে রঙের কার্পেট বিছানো। এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর বন্ধুর অন্তরের টান টেনে নিয়ে এলো দিনকুড়ি পর পি. ডবলু. ডি.-র কোয়ার্টারে।

আমাকে পেয়ে রামশরণের চোখে খুশির জোয়ার। পথের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

রামশরণকে জিজ্ঞেস করলুম, এখন লাগছে কেমন এখানে?

রামশরণ অস্থির কণ্ঠে বললে—আর বলো কেন, তোমার সঙ্গে দেখা হবার দিন-দুয়েক পর থেকে এক উপসর্গ জুটেছে। উপসর্গটির উৎপাত রোজই চলেছে এখন। নিজেই দেখে-শুনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ

ভঞ্জন করবে।

—এই কোয়ার্টারের আগের ওভারসীয়ার সাহেব নাকি একটি গাড়োয়ালী মেয়েকে কথা দিয়ে গেছেন, ফিরে এসে বিয়ে করবেন। তাই ওভারসীয়ার সাহেব কবে আসবেন রোজই শোনা চাই মেয়েটির। নিত্যি ওকে বলতে হবে, আর এতো দিন বাকি আছে সাহেব ফেরবার। এও যেন আমার এক ডিউটি হয়ে দাঁড়িয়েছে! উত্ত্যক্ত করে মারছে মেয়েটি। মেয়েটির সরলতার জন্যে, ওর অকৃত্রিম প্রেমের জন্যে সহানুভূতি এসেছিলো প্রথম প্রথম। কিন্তু দিন নেই রাত নেই, সময়-অসময়, কাজকর্ম কিছু না বুঝে, ও যদি আসা-যাওয়া করে এইভাবে, লোকে কী বলবে? আমার মান-ইজ্জত সব যাবার যোগাড় আগের ওভারসীয়ারের জন্যে। আর দুটো দিন কাটলে চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে। মন্দাকিনীর জল মাথায় ছিটিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করে বাঁচি। বারণ করলেও অবুঝ মেয়ে শোনে না, আসতেও ছাড়ে না। সময়ে সময়ে মনে হয় জেনেশুনে আমায় বিপদে ফেলার চক্রান্ত করছে ও। সাহেবের খবর একটা অজুহাত মাত্র। আমার মন বিষিয়ে উঠছে ক্রমে ওর ওপর।

রামশরণকে বোঝালুম—এতোদিন যখন কাটালে, তখন বাকি দুটো দিনও কেটে যাবে। একটু ধৈর্য ধরো। এ নিয়ে ওদের সঙ্গে চটাচটি করলে, একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে, একটা ফ্যাসাদ বাধতে পারে।

মনে হল, রামশরণ কথাটার গুরুত্ব দিলে। উত্তেজনা কমে আসতে লাগলো ওর।

পরের দিন। বিকেল চারটে।

বারান্দায় বসে আছি দুজনে—আমি আর রামশরণ। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, দূরে একটি পাহাড়ী যুবতী মেয়ে। সবুজ পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। মেয়েটি হাসতে হাসতে ওড়না মুখে চাপা দিয়ে আমাদের কাছে এলো। ঘাগরা দুলিয়ে, রামশরণের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

আমি স্তম্ভিত। কেমন বেহায়া নির্লজ্জ এ মেয়ে! ক্ষমার অযোগ্য স্পর্ধা! রামশরণ যা যা বলেছে, তার একবর্ণও মিথ্যে নয়তো দেখছি!

মেয়েটি ঠোঁটের ফাঁকে সাদা ধবধবে দাঁতগুলো বার করে বললে, সাহাব ওয়ো কাল জরুর আয়েঙ্গে? রামশরণ নিরুত্তর। কেবল ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। মেয়েটির আনন্দ আর ধরে না। চোখে-মুখে উপচে পড়লো। জোড় হাত করে, নমস্তে বলে, চলার পথে পা বাড়ালো!

তার পরের দিন।

রামশরণ পাহাড় ফাটানো-ব্লাস্টিং দেখাতে নিয়ে এলো আমায়। পাহাড় ফাটিয়ে যাত্রীগাড়ি চলার পথ তৈরী করা হচ্ছে। বিপজ্জনক এলাকা অবধি লাল নিশান পোঁতা। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানো হবে। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে। এমন সময় আগের দিনের মেয়েটি এসে উপস্থিত হল একপাল ভেড়া নিয়ে। রামশরণের মুখ ফ্যাকাশে—বিবর্ণ।

—হট্ যায়ো অনসূয়া! হট্ যায়ো! মর যায়োগী! রামশরণের গলা কেঁপে উঠলো।

অনসূয়ার কিন্তু রামশরণের কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই। আচ্ছন্নের মতো সে এগিয়ে আসছে ক্রমে বিপজ্জনক এলাকার কাছে, আরো কাছে।

চুপ করে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না রামশরণ। দৌড়ে গিয়ে মেয়েটির আসা-পথ অবরোধ করলো। দু'হাত দিয়ে ওর হাত দুটো ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিলে। মেয়েটি চমকে উঠলো। সম্বিত ফিরে পেলো। ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ফেরার পথ ধরলো।

দুপুর একটা।

ব্লাস্টিং শেষে কোয়ার্টারে ফিরে বিশ্রাম করতে করতে, দুই বন্ধুতে অনসূয়া আলোচনা পর্ব চলতে লাগলো। তখন অনসূয়ার নির্ঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচার দৃশ্যটা ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। অনসূয়ার কথা কইতে কইতে রামশরণের চোখ-মুখ রাগে রক্তবর্ণ হয়ে

উঠলো। রামশরণ বললে—এই রকম আরো দু'বার বেঁচে গেছে ও, তবু ওর লজ্জা নেই! মরণের ভয় নেই! খেয়াল নেই কোনো কিছুতে—এমন উন্মনা! 'সাহেব কবে আসবে, সাহেব কবে আসবে'—এই নিয়েই পাগল একেবারে। আমায় জ্বালাতন করে মারছে। উঃ! কী অঘটনই না ঘটে যেতো, ওকে না ধরে ফেললে—এক সেকেণ্ড দেরী হয়ে গেলে—

রামশরণের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই অনসূয়া এসে হাজির। একগাল হাসি মুখে সপ্রশ্ন চোখে জিজ্ঞেস করলে অনসূয়া—ওয়ো ক বাজে আয়েঙ্গে সাহাব?

রামশরণের চোখে-মুখে বিরক্তি। জোর গলায় বলে উঠলো—ওয়ো কভি আয়েঙ্গে নহী। খবর মিলা মর গ্যয়া।

—মর-গ্য-য়া। অস্ফুট হৃদয় ছেঁড়া আর্তনাদ অনসূয়ার কণ্ঠ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। ওর সর্বশরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো।

অনসূয়া কান্নাভেজা গলায় বললে, নহী! কভি নহী হো সক্তা। অঞ্জন সাহেব যে বলে গেছলো আমি মলে 'তুমি এক দণ্ডও বাঁচবে না, তুমি ম'লে আমিও বাঁচবো না। ঝড়ের বেগে পড়িমরি করে, দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চললো অনসূয়া।

হতভম্ব হয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো রামশরণ। মুহূর্ত মধ্যে কি যে ঘটে গেলো, কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। রামশরণকে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে চেতনা পেলো ও। আমরা দুজনেই দেখলুম, পুলের ওপর দিয়ে অনসূয়া চলেছে। এলোমেলো পা পড়ছে। শরীর টলছে। রামশরণ অন্তর্ভেদী চীৎকার করে উঠলো—অনসূয়া ঠাহর যায়ো! হুঁশিয়ার!

কে কার কথা শুনবে! অনসূয়া চলেছে তো চলেছে। পেছনে প্রাণপণে ছুটছে রামশরণ, তার পেছনে আমি।

অনসূয়া ওপারে চড়াই পাহাড়ী রাস্তায় উঠছে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তার সমস্ত দেহটা অসম্ভব রকম কাঁপছে। রুদ্ধশ্বাসে দৌড়োচ্ছি দুজনে বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটা যন্ত্রণা নিয়ে। একটু পা

ফেলার উনিশ-বিশে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যাবে এখুনি! ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেলো। মরণখাদের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেলো অনসূয়া।

চোখে হাত চাপা দিয়ে পুলের ওপরই বসে পড়লো রামশরণ। পাগলের মতো নিজে নিজেই বলে চললো—একি করলুম! কি বলতে কী বললুম। এতোদিনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিলুম এক মুহূর্তে। আমিই অনসূয়ার মৃত্যুর কারণ হলুম শেষে!

রামশরণকে বোঝাবার ভাষা খুঁজে পেলুম না। কেবল স্তোক-বাক্য দিলুম—ি[illegible]তর টান। তোমার দোষ কী?

পরের দিন দুপুরে রামশরণের নামে হেড অফিস থেকে চিঠি এলো। চিঠিখানা পড়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলে রামশরণ।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম! চোখকে বিশ্বাস করবো, না করবো না? চিঠির ভাষাগুলো জীবন্ত হয়ে আমার সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। হেড অফিস জানিয়েছে—

পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত রামশরণের ফেরার পথ বন্ধ। গতকাল দুপুর একটায় ওভারসীয়ার অঞ্জন এক্সিডেন্টে মারা গেছেন—কাজে যোগদানের জন্য হেড অফিস হয়ে জীপে করে আসবার পথে। পাহাড়ী খাদে জীপ উল্টে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা।

অসহ্য আগুনের হল্‌কা। অর্ধশরীরে পোড়ার জ্বালা ধরছে। ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ একেবারে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না একটু। মনে মনে বলছি, জল—একটু জল।

হঠাৎ এরকম দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতেই ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। এর আগে এ ধরনের স্বপ্ন দেখিনি কখনো। এই প্রথম। ঘুম ভাঙার পর ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছি বিছানায়। সচকিত হয়ে চারদিকে তাকিয়েছি। সব ঠিক আছে। কোথাও কোনো জিনিসের নড়চড় একটুও হয়নি। ঘুমুবার আগে যেখানে যে জিনিস দেখেছিলুম—তেমনিই আছে। পোড়েনি কিছু।

স্বপ্নটাকে স্বপ্ন জেনেও মিথ্যে ভাবতে পারিনি আমি। মনে হয়েছিল আগুনের হল্‌কা লাগাটা বাস্তব সত্যি। এই সত্যিটাকে আমার মন থেকে আমার অনুভূতি থেকে চেষ্টা করেও এক চুল সরাতে পারিনি। তাই ঘরের আসবাবপত্রের পিছন থেকে শুরু করে বিছানার তলা পর্যন্ত আগুন খুঁজেছি। পাইনি। কেন জানি নে—সে সময়টায় আমায় এই রকমই পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল।

দক্ষিণ দেয়ালের কুলুঙ্গির দিকে তাকাচ্ছিলুম বার বার। ঘরের মধ্যে ঐ একটা জায়গায় আগুনের একটিমাত্র শিখা দেখা যাচ্ছে। কাঠের পিলসুজের ওপর পিতলের প্রদীপের সলতে জ্বলছে। তেল পুড়েছে অর্ধেক। তেজ কমেনি। প্রথমের মতোই রয়েছে। রোজই সারারাত ধরে জ্বলে প্রদীপটা। ওর আলো লাগে চোখে-দেহে। তাপ লাগে না।

সে রাতে অন্য কোনো আগুন দেখতে পাইনি বলেই হয়তো প্রদীপের তাপটাই ভীষণ উত্তাপ হয়ে উঠল আমার কাছে যেন। মনে

হল ঐ আগুনটাই নিশ্চিত আমাকে ঘুম থেকে তুলেছে—জাগিয়ে আরো বেশী করে জ্বালাবে বলে। ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। জানলার দিকে এগুতে যাচ্ছি—রাজ্যের ভয় ছেঁকে ধরল আমাকে।

এত ভয় যে আমার ভিতর পোষা ছিল—বুঝিনি কোনো দিন। ভয়কে ভীতু মানুষকে ঘেন্না করেই এসেছি বরাবর। একি বিভ্রান্তি আমার। নিজের কাছে নিজেকে যেন কেমন ঠেকতে লাগল। মিথ্যে ভয়কে তাড়াবার জন্য - আত্মসচেতন হয়ে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম।

নির্জন ঘরে একা আমি। তবুও চোখ বুলিয়ে নিলুম ঘরের চতুর্দিকে। আমার এ দুরবস্থা আমার এ মনের দুর্বলতা কেউ বুঝতে পারছে কিনা। না, সমস্ত জানলা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করাই আছে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যে বাইরে থেকে কেউ দেখতে পেতে পারে আমাকে—আমার মনের কথা নিঃশ্বাসের আওয়াজে পৌঁছে যেতে পারে কারো কানে। নিশ্চিন্ত হলুম খানিকটা। প্রাসাদপুরীর লোকজনের কাছে আমার মানসম্ভ্রম খোয়া যাবে না। আমি জেদী আমি দুঃসাহসী আমি বেপরোয়া—এসব নামের খেতাব আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না কেউ।

দু' দুটো কালরাত্রিকে নেমে আসতে দেখেছি আমি আমার জীবনে। আশ্চর্য! প্রথমটায়ও ভয় পাওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু একটুও পাইনি। ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও না।

সে-রাতের কথা মনে পড়লে আজও বসে বসে ভাবি আমি একা। ভাবি পঁয়তিরিশ বছরের আমির কথা ষাট বছরের আমি। কম বয়সে কত না অসম্ভব কাজ সম্ভব করেছি বিনা দ্বিধায় নির্ভয়ে।

একবার এই রাসনগ্রাম থেকে উত্তর দিকে যেতে হয়েছিল আমায়। জমি-জায়গার ব্যাপার নিয়ে একটু দেখাশোনা করতে গেছলুম সেখানে। সঙ্গে যিনি ছিলেন—তিনি আমার অতি প্রিয়। জীবনের চেয়েও।

কথার মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেলেন জয়াবতী। ওঁর প্রসন্নমুখে বেদনার ছায়া নেমে এলো।

বারান্দায় ছুটো বেতের মোড়ায় আমরা সামনাসামনি বসে আছি হুজনে। উনি বলছিলেন, আমি শুনছিলুম। অকস্মাৎ ওঁর ভাব পরিবর্তনে ভিতরে ভিতরে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলুম আমি। ওঁর চোখের কোণে জলের কণা টলমল করে উঠতে দেখেছিলুম। হয়তো প্রিয়জনের ব্যাপার নিয়ে কোনো ব্যথার স্মৃতি ওঁর চোখের সামনে কথা বলতে বলতে ভেসে উঠেছিল।

জয়াবতী যে শক্তমনের মানুষ—বেশ বুঝতে পারা গেল একটু পরেই। বেশীক্ষণ সময় নেননি উনি। নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই ফিরে এসেছিলেন আগের কথায় আবার।

—আমার সঙ্গে ছিলেন স্বামী। উনি আমার সঙ্গে ছিলেন বললে ভুল হবে। আমিই ওনার সঙ্গে ছিলুম। যেখানে যেতেন— নিয়ে যেতে না চাইলেও ওনার সঙ্গ ছাড়তুম না আমি। শ্বশুর বলে গেছলেন, বহুরানী ছেলের সঙ্গ ছাড়বে না কোনোদিন। ও বড় আপনভোলা। বিষয়আশয় কিছু বোঝে না। ওকে ভুলভাল বুঝিয়ে সর্বস্ব আত্মসাৎ করে নেবার সুবিধে অনেকের।

সত্যিই উনি মাটির মানুষ ছিলেন। যতদিন ছিলেন উনি, কাছ ছাড়া হইনি একবারের জন্যও। শ্বশুরের সব কথাই মনেপ্রাণে খোদাই করে রেখেছিলুম। পালন করতে চেষ্টা করতুম। তিনি বেঁচে থাকতে অনেক সময় - আমার সব চেষ্টাতে যুদ্ধ করতে হয়েছে নিজের সঙ্গে। বিবেকের সঙ্গে।

শ্বশুরের বিপরীত মত স্বামীর।

সম্পত্তি নিয়ে কি কেউ যাবে? বাবুজী যেন কি! উনি বলতেন, বিষয়ের ওপর অত কড়া নজরের পাহারা দেওয়া উচিত নয়। পাঁচজন গরীব-ছুঃখী যদি ও-থেকে দিন গুজরান করে—করুক না।

শ্বশুরের মতে স্বামীকে আনতে পারিনি কোনো দিন। স্বামীর

মতে শ্বশুরকে আনতে চেষ্টা করেছি যখুনি, তখুনি বিয়ে হবার কাহিনী শুনতে হয়েছে আমাকে নতুন করে শ্বশুরের মুখে।

বহুরানীকে সাধ করে ঘরে এনেছিলেন কেন—তা কি বহুরানী জানে না? কোনো দুঃখকষ্ট বা খোঁটা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে বলছেন না কিছু শ্বশুর। বলছেন খালি বহুরানীর মনের জোরটা ঠিক করে ধরে রাখবার জন্য।

শ্বশুরের সমান ঘর নয় বহুরানীর। শ্বশুরদের ব শ পরিচয় ইতিহাসের পাতায়। পাঁচশো বছর আগের এই বংশেরই রাজা রাসনের বল্লভদেবজীউ দিল্লীশ্বরের পাঠান সৈন্যদের সঙ্গে মরণপণ করে লড়েছিলেন। এখনো গণ্ডপাহাড়ের ওপর সে নিশানা বর্তমান। ভাঙা দুর্গ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বহুরানীর বাবা শ্বশুরদের প্রজা। প্রজা হলে কি হবে? প্রজার ঘরে থাকবার জন্য জন্মায়নি বহুরানী। ওকে যখন প্রথম দেখেন শ্বশুর - যে পরিস্থিতিতে দেখেন—তখনই ওর ভিতরটা দেখতে পেয়েছিলেন নাকি। ওর আসল রূপ দেখে তিনি প্রথমে স্তম্ভিত। পরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে, ছেলেকে আদেশ করেন ঘোড়ার পিঠে তুলে নিতে। বহুরানীকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসেন বাবা-ছেলে রাসনগ্রামের রাজপ্রাসাদে।

সেদিনকার বহুরানীর বীরাঙ্গনা মূর্তি ভুলতে পারবেন না কখনো শ্বশুর। গাঁও-এর লোকেরা যে সাহস করেনি বার বছর বয়েসের মেয়ে সেই সাহসে ভর করে কুড়ুল হাতে পাহাড়ী গোখরোর পিছু পিছু দৌড়েছিল। সাক্ষাৎ মৃত্যু গোখরো সাপ পিছু নিয়েছিল শ্বশুরের। পিছু নিয়েছিল স্বামীর। নিজের জীবন বিপন্ন করে পিছন থেকে এসে কুড়ুলের ঘায়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল বিষাক্ত গোখরোকে।

এই রকম মেয়েকেই বুঝি খুঁজছিলেন শ্বশুর নিজের অজ্ঞাতেই। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলেন। বহুরানী শুধু তাঁর পুত্রবধূ নয়, তাঁর বীরসন্তানও। একাই একশো এ মেয়ে। রক্ষে করবে সম্পত্তি রক্ষে করবে

স্বামীকে। রক্ষে করবে শ্বশুর কুলের মর্যাদা। এবারে মরেও শান্তি পাবেন শ্বশুর।

শ্বশুরের কাছ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে দশগুণ শক্তি ফিরে পেতুম আমি দেহমনে। ওঁর কাছ থেকে ফিরে এসে কোনো কাজ করে ফেললে, দেখতুম স্বামী কিছু বলতেন না। এর কারণ কি—প্রথম প্রথম বুঝতুম না। একদিন বুঝতে পারলুম স্পষ্ট। জিজ্ঞেস করলুম ওনাকে—বাবুজীর মত-পথ তুমি তো একেবারেই পছন্দ কর না – অথচ তোমার কথা মতো কিছু করতে পারিনে—তোমার রাগ-দুঃখ হয় না আমার ওপর ?

খানিক মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন উনি—তোমাকে দেখলে—গোখরো সাপ কোপানোর কথাটাই মনে পড়ে আমার কেবল।

ফাঁক পেলেই উনি আমায় কবি মির্জা গালিবের কবিতা শোনাতে ভুলতেন না।—কেওঁ না ফিরদৌসসে দোজখকো মিলালে ইয়ারব। স্বর্গ নরককে এক করে মিলিয়ে নেবে না কেন বন্ধু ?

এ কবিতা শোনানোর উদ্দেশ্য কি—বুঝতে আর বাকি থাকত না আমার। চমনলালের জন্যই কবিতা শোনাতেন উনি।

একমাত্র ভাগনে চমনলাল। অনেক আদরের ভাগনে আমার স্বামীর। স্বামীর আদরের বটে, কিন্তু শ্বশুরের দু'চক্ষের বিষ। শ্বশুরের কাছে চমনলাল অবাধ্যের প্রতিমূর্তি। সরাবী। উচ্ছৃঙ্খলতাই ওর জীবনের পাথেয়। ওকে অন্দরমহল-বারমহলে—কোনো মহলেই স্থান দেওয়া চলে না। বিষয়-সম্পত্তির কিছু অংশ দেওয়া হবে ভাবা গেছল—কিন্তু ও যখন মনের বাইরে চলে গেছে, তখন বিষয়ের বাইরেও চলে গেছে।

শ্বশুরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চমনলাল সম্বন্ধে ধারণা বদলাতে পারিনি। ওর জন্য মানসিক অশান্তি আমার লেগেই ছিল। পিতৃমাতৃহারা ছেলে—এই বাড়িতেই মানুষ। ও পথে পথে ঘুরে বেড়াবে আর আমরা ইমারতে বাস করব—সুখভোগ করব—এ কেমন করে হয়। তাছাড়া

আমাদের ছেলেপুলে নেই। একেই কোলে-বুকে করে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করেছি। ওই আমাদের ছেলে। শ্বশুর যতদিন ছিলেন, তাঁর চোখের আড়ালে ওকে সাহায্য করতুম আমরা স্বামী-স্ত্রীতে।

সর্বরকমে সাহায্য করেও, সদা রুষ্ট মনের মানুষ চমনলালকে তুষ্ট করতে পারিনি আমরা কোনো সময়। ও ভাবত আমিই শ্বশুরের মন ভাঙিয়ে চোখের বিষ করে দিয়েছি ওকে। আমাদের চিরশত্রু ছোট তরফের জ্ঞাতি স্বজনদের প্ররোচনায় মাথাটা বিগড়ে গেছল ওর। আমাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করে নিয়েছিল ওরা ওকে। তারাই যা তা বোঝাত। আমার ওপর ভুল ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল।

স্বামী জানতেন কোনো অন্যায় বরদাস্ত করা আমার ধাতে সয় না। তাই আমাকে মাঝে মাঝে মির্জা গালিবের কবিতা শুনিয়ে সচেতন রাখতেন। আমি যাতে চমনলালের ওপর বিরূপ না হই। ওকে ঘেন্না করে ওর মুখ দেখা বন্ধ করে না দিই। চমনলালের দুর্ব্যবহারকে উনি এইভাবেই ঢেকে রাখতে চেষ্টা করতেন আমার কাছে।

এহেন মানুষের মনেরও অদ্ভুত পরিবর্তন হতে দেখেছিলুম শ্বশুর মারা যাবার পর। তিনি চলে যাবার বছর খানেক পরেই এই পরিবর্তন এসেছিল। শ্বশুর থাকতেই ওনার শরীর একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করেছিল। যেতে আরো বেশী করে ভাঙতে লাগল। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলে, উত্তর দিতেন না কিছু উনি। লক্ষ্য করতুম, একটা বুক ভাঙা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঝরে পড়ত শুধু।

এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস যে ওনার দীর্ঘজীবনকে ক্ষয় করে নিয়ে আসছিল বুঝতে পারিনি। জানাননি উনি। যখন বুঝলুম, যখন জানালেন—তখন আমি নিরুপায়। উনি শেষের দিন গুনে চলেছেন আর আমি সেই দিন গোনার নীরব সাক্ষী হয়ে চলেছি।

নির্মম পরিস্থিতি। কোনো কিছু করতে গেলে—নিষেধ করতেন উনি। অনেক করেছেন। তলায় তলায় ডাক্তার বদ্যি দেখিয়েও

কোনো ফল পাননি। কেউ নাকি রোগ ধরতে পারছেন না। সবার বারণ সত্ত্বেও বিষয়ী বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার জন্যই ছোট তরফদের ওখানে নেমন্তন্ন খেতে গেছলেন। তারপর থেকেই খিদেতেষ্টা গেছে। শরীরটাও শুকোতে শুরু হয়েছে। আর কোনো কিছুতেই কিছু হবে না বেশ বুঝতে পেরেছেন উনি।

নিষেধের গণ্ডি পেরিয়েও ওনাকে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি আমি। পণ্ডশ্রম হয়েছে। চমনলালের ব্যাপারটা একটা ঘূর্ণি ঝড়ের মতো আচমকা এসে পৌঁছুল। সব তছনছ করে দিয়ে চলে গেল যেন। ওনাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিয়ে গেল।

তখন আমরা রাসনের উত্তরে অমন গাঁও-এ। হঠাৎ খবর এলো— বাড়ির আসবাবপত্র সমস্ত বিক্রি করে দিচ্ছে চমনলাল। বাড়িতে বাইজীদের নাচগান আর হুল্লোড় চলছে দিনরাত। শুনে ওনার মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল। এরকম গম্ভীর এর আগে দেখিনি। বিড় বিড় করে বললেন, বাইশ বছরের এই মূর্তি! আরো বয়েস বাড়লে না জানি কি হবে ও!

দিন সাতেক পর। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে সে সময়। পশ্চিমদিকের জানলাটা খুলে আকাশ দেখছি আমি। লাল রঙটা মুছে গিয়ে সাদা এলো। সাদার ওপর কালোর প্রলেপ পড়ছে এবার। পাশে এসে দাঁড়ালেন উনি। মোড়া কাগজটা হাতে দিয়ে বললেন, উইল পড়। উইলটা দেখে চমকে উঠলুম আমি। তবে কি উনি - মনের মধ্যে একটা হাহাকার গুমরে উঠতে লাগল আমার। একটা অব্যক্ত বেদনার ধাক্কায় সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। যে হাতটায় উইলের কাগজটা ধরা ছিল, সে-হাতটা বড্ড বেশী কাঁপছিল। অবশ হয়ে আসছিল। মেঝেয় পড়ে গেল কাগজটা।

উনি তুলে নিলেন। হাত ধরে বসালেন আমায়। বোঝালেন। আত্মার মৃত্যু নেই। এও জানালেন, আমার মতো মেয়ের এরকম দুর্বল চিত্ত হওয়া শোভা পায় না। চমনলালকে অনেক শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন উনি। পারেননি। বাবা চলে যাবার পর বাড়িতে

স্থান দিয়েছিলেন। ভুল করেছিলেন বিষয়ের ভাগ দেবেন ভেবেছিলেন, দিলে আরো মস্ত বড় ভুল করা হত। ভুল সংশোধন করেছেন উনি নিজে হাতে। সমস্ত জয়াবতীর। স্থাবর অস্থাবর - যা কিছু আছে – সবের মালিক একা জয়াবতীই। চমনলাল এক কপর্দকও পাবে না।

চমনলালের ওপর এত বিতৃষ্ণা-অবিশ্বাস এসে গেছল ওনার যে উনি আমায় সাবধান করে দিতেও ভোলেননি। যদি এখানে হঠাৎ মরে যাই আমি—তা হলে যে কোনো উপায়ে আমার দেহটাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বাড়ি নিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত যেন চমনলালের কানে কোনো খবর না পৌঁছয়। খবর পৌঁছুলে বাড়ি ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে তোমার।

ওনার আদেশ পালন করবার জন্য প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়ে তবে ছেড়েছিলেন আমায়।

উইল করার পর, দিন পনেরোর ভিতর—এক একদিন এক এক রকমের পরিবর্তন হচ্ছিল চেহারার ওনার। ক্রমশ কম জোর থেকে আরো কম জোর হয়ে পড়েছিলেন। বেশ লক্ষ্য পড়ছিল, খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে এটা। আমাকে নিয়ে বাড়ি ফেরবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন খুব। আমি রাজী হলুম না। এরকম অবস্থায় রাস্তাঘাটে না বিপদ ঘটে শেষে। তাছাড়া চমনলালকে দেখে, চমনলালের কীর্তিকলাপ দেখে উত্তেজনায় না তাড়াতাড়ি কিছু হয়ে বসে ওনার।

পনেরো দিনের দিনই চলে গেলেন উনি। সেদিনের রাত আমার সঙ্গে এক নির্দয় খেলা খেলেছিল। ওনাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে। সে কাল রাত্রি ওনাকে আমার বাইরের চোখের সামনে থেকে সরাতে পেরেছিল সত্যি—কিন্তু আমার মনের চোখে দেখা থেকে সরাতে পারেনি আমার স্বামীকে আজো।

ওনার কথা রেখেছিলুম আমি। দেহটাকে সাজিয়েছিলুম সুস্থ মানুষের মতো জামা কাপড় পরিয়ে। একলা ঘরে ওনাকে নিয়ে একটুও ভয় করেনি আমার। কেবলি মনে হয়েছে—উনি মরেননি।

মরতে পারেন না। আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মার মৃত্যু নেই—ওনার এই শেষ কথাটাই আমার মনে অসীম সাহস এনে দিয়েছিল। হারানো স্বামীকে ফিরে পেয়েছিলুম আমি কাছে—আরো কাছে। এত কাছে বোধ হয় কোনো দিন পাইনি।

ত্ব'জন বিশ্বাসী লোক দিয়ে পাল্কিতে ওঠালুম আমি ওনার নিষ্প্রাণ দেহটাকে। তারপর দেহটার সঙ্গী হলাম আমি একা। মশাল হাতে নিয়ে চলছে পাল্কি ঘিরে ঘিরে আমাদের লোকলস্কর। সারা রাত ধরে অন্ধকার ছিঁড়েখুড়ে জঙ্গলের গাছপালার পাশ কাটিয়ে মাড়িয়ে দেহাতী লোকদের খুবরীর সামনে দিয়ে পাল্কি চলল আমাদের। কৌতূহলী লোকরা প্রশ্ন করে জানতে পারল শুধু—মালিক সাহেবের ভাগনের অসুখের খবর পেয়ে রাতেই চলেছেন।

ভোর রাতে ফিরে এলুম আমরা রাসনের বাড়িতে। খিড়কির দরজা দিয়ে প্রবেশ করলুম। তখন চমনলাল নেশার বিষে পড়ে আছে। ঘুমে অচেতন হয়ে আছে।

মনে রাখার মতো ত্নটি রাত এসেছিল আমার জীবনে। ত্নটিতে প্রায় বছর চারেকের তফাত। প্রথমটিতে কোনো ভয় ধরেনি একটি বারের জন্যও। দ্বিতীয়টিতে ভয়—মহা ভয়। স্বপ্নের তাপ আমার মনে জেঁকে বসেছিল। তাই কল্পনার ভীষণ উত্তাপ আমায় পাগল করে তুলছিল। নিজেকে সামলাতে পারছিলুম না আমি কিছুতেই। ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠছিল ভিতরটা। জানলা খুলে দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম আমি। ভয়। পা ত্নটো মেঝেয় আটকে গেছে যেন।

দাঁড়িয়ে আছি। কয়েক মুহূর্ত। এবার নিজের কাছে নিজেকে আশ্চর্য ঠেকতে লাগল আমার। আটকে পড়া ত্ন পা চলতে শুরু করেছে আবার নিজের অজ্ঞাতসারেই। জানলার কাছে এলুম আমি। জানলা খুলতেই মাঘের শেষের হাড়কাঁপানো কনকনে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে আছড়ে পড়ল আমার চোখে মুখে। আর সেই সঙ্গে

নীচে থেকে অনেক মানুষের গলার আর্তনাদ চীৎকার কানে এসে পৌছুল আমার। নীচের দিকে তাকাতেই দেখলুম-যতদূর চোখ যায় মশালের আগুন আর আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কারা এসেছে মশাল নিয়ে—বুঝতে আর বাকি রইল না আমার। আপাদমস্তক কালো রঙ মাখা আর তেল চকচকে সাজোয়ান মানুষের দলকে শায়েস্তা করবার জন্য আমার মাথার রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠল ওদের শায়েস্তা করবার অস্ত্রও ছিল আমার চোখের সামনে —আমার হাতের কাছে।

দরজার পাশের দেওয়ালে ঝুলছিল পর পর শ্বশুরের বন্দুক তলোয়ার আর ইষ্টদেবী ভবানীর ধারাল খড়্গ। ছোট অবস্থায় ঘরে এনেছিলেন শ্বশুর আমায়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিটি অস্ত্র চালনা করতে শিক্ষাও দিয়েছিলেন নিজেই। তিনি শক্তির পূজারী ছিলেন, আমাকে শোনাবার উদ্দেশ্যে, আমাকে মনে রাখাবার জন্য—বার বার বলতেন নিজের শক্তি আর অস্ত্র—এ দুটি নিজেকে বাঁচায় অন্যকে বাঁচায়।

দরজার কাছে এলুম ছুটে। বন্দুকটা নেব বলে দেওয়ালে হাত ঠেকিয়েছি সবে—মাথায় বাজ পড়ল যেন আমার। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। 'কার কণ্ঠস্বর শুনলুম আমি। নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পারলুম না। আবার শুনছি একই মানুষের গলা। -দরজা ভেঙে ফেল তাড়াতাড়ি। শেষ করে ফেলতে হবে শয়তানীকে এখুনি আমার চোখের সামনে।

দরজায় ঘা পড়ছে আমার। এক সঙ্গে সবল হাতের অনেক কুড়ুলের ঘা পড়ছে বেশ বুঝতে পারছি। দরজার পাল্লা দুটো ভেঙে টুকরো টুকরো হতে দেরী হবে না আর বেশী। কিন্তু তবুও আমি অস্ত্র ধরতে পারলুম না। বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে আমার।

শেষবারের মতো বন্দুকটা পাড়তে চেষ্টা করলুম। পারলুম না। কার বুকে গুলী চালাব আমি? যে এসেছে, যে ডাকাতদের নির্দেশ দিচ্ছে সে তো এই বংশেরই। পৌত্র না হোক, দৌহিত্র তো বটে।

ছোট থেকে আমাকেই মা বলে জেনেছে চমনলাল। মা বলেই ডেকেছে সে। সেই চমনলাল এসেছে আমায় শেষ করতে ওরই চোখের সামনে !

মাথার ভিতর ঝিমঝিম করছে আমার। বোনপো ব্রীজমোহনকে দত্তক নিতে বলে গেছলেন উনি, আমি নিইনি। ভেবেছিলুম, বিশ্বাস করেছিলুম, ফিরে আসবে একদিন চমনলাল। এভাবে যে ফিরে আসতে পারে মানুষ—আমার ধারণার বাইরে ছিল। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—আঘাত পেয়ে যদি নিজেকে চিনতে পারে কোনো দিন—নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে কোনো দিন।

চমনলালকে ডাকাত তৈরী করার মূলে আমিই। ভুল করেছি আমি। ঘর ছাড়া না করলে এ অবস্থা হত না হয়তো ওর আজ। ওর মনোভাব জানতুম আমি। কানে কানে শুনেছিলুমও সব। আমিই নাকি ওকে নিঃস্ব করবার জন্য ওর দাদামশাই-এর-ওর মামাব মন ভাঙিয়ে সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করেছি। আমার ওপর ওর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে—ভিতরে ভিতরে একটা জাতক্রোধ গড়ে উঠছিল এসব জেনে-শুনেও প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় দেখাতে গিয়ে পরোক্ষে আরো দুর্দান্ত করে তুলেছি ওকে অবহেলা করে করে। আমার ওপর ওর প্রতিশোধ-স্পৃহাটা আমিই জাগিয়ে তুলেছি।

এসব চিন্তায় সমস্ত দেহটা অবশ হয়ে আসতে লাগল আমার। চমলালের কথা ক'টা কানে বড্ড বেশী বাজতে লাগল। শেষ করে ফেলতে হবে···আমার চোখের সামনে। ওর চোখের সামনের চেয়ে চোখের আড়ালেই শেষ হওয়া উচিত আমার। আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখতে আত্মঘাতী হব বলে বন্দুকটা নেবার জন্য হাত বাড়াতে চেষ্টা করলুম। পারলুম না। দেওয়াল অবধি হাত পৌঁছুল না। মাথা ঘুরছে। সারা শরীরটা টলছে। বিছানাটা টানছে আমায়। আচ্ছন্নের মতো বিছানায় এসে দেহটা এলিয়ে দিলুম।

একটা ঘুম ঘুম ভাব আসছে আমার। কেবলি মনে হচ্ছে, আমার শেষ মুহূর্ত নেমে আসছে চোখের সামনে বুঝি। চোখের পাতা

হুটো ভারী ভারী হয়ে উঠছে। হঠাৎ জানলা দিয়ে একটা দমকা বাতাস এসে প্রদীপটাকে নিবিয়ে দিল। মনে হতে লাগল জমাট অন্ধকারে ঘরটায় সব কিছু হারিয়ে গেল। হারিয়ে যাচ্ছি আমিও। সব ভুলে যাচ্ছি। স্থান কাল ঘর বাড়ি। কেবল বহুদিন আগের—ছোটবেলার বেদিনী খেলাটার দৃশ্য ভেসে উঠছে আমার মনের চোখে।

বেদিনীরা ছোট্ট টুকরীতে ছোট্ট মেয়ে পুরে কাপড় আড়াল দিয়ে একটু বেখে, পরে কাপড় সরিয়ে টুকরী খুলে দেখাত—অদৃশ্য হয়েছে মেয়েটি। এ খেলা অনেকবার দেখেছি আমি। বড় ভালো লাগত। সঙ্গিনীদের নিয়ে ওদের খেলার অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছি অনেকবার। মনে মনে নিজে অদৃশ্য হতে চেষ্টা কবেছি। পারিনি। আমার খেলা নিয়ে বাড়ির অনেকেই ঠাট্টা তামাশা করেছে। অনেকে কৌতুক করেই বলেছে শরীর পতন কি মন্ত্র সাধন—চেষ্টায় মানুষের কি না হয়। সবুরে মেওয়া ফলবে তোমারও। মানে অদৃশ্য হবে তুমিও একদিন।

পুবনো দিনের অদৃশ্য হবার উদ্ভট কল্পনা বহুদিন পর এ-সময়ে কেন পেয়ে বসল আমায় বুঝে উঠতে পারলুম না। আর কিছু বোঝবার ক্ষমতা৷ও হারিয়ে ফেলেছিলুম তখন।

আমি দেখছি, অন্ধকার থেকে অন্ধকারে-আরো-আরো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি যেন। এক একটা মিশমিশে কালো রঙের পরদার পর পরদা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে যেন আমায় কে। আশ্চর্য! আমার মনে হতে লাগল, দেহহীন আমি ঘরে রয়েছি শুধু।

আমার দেহহীন আমি এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দরজা ভাঙা শেষ হল। ঘরে ঢুকল চমনলাল।—চমনলালের দল। আমার চারপাশ দিয়ে ঘুরল তারা। খুঁজল আমাকে। শেষে সবার সঙ্গে 'শয়তানী ভেল্কি জানে নিশ্চয়—সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে', 'বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে চমনলাল।

এবারে আমি যেন আমার দেহ আমার অস্তিত্ব—সব কিছু ফিরে

পেতে লাগলুম এক এক করে আবার। বড় ক্লান্ত বোধ হতে লাগল। ঘুমের কোলে ঢলে পড়লুম আমি।

পরদিন। ভোরের আলো চোখে পড়তে ঘুম ভাঙল আমার। চোখ চেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। বুড়ো মা-বাবা আর ভাই দাঁড়িয়ে সামনে। চারদিকে আত্মীয়-স্বজন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত লোক আমার কাছে কেন? জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরছি সবার মুখের ওপর। পাশের গ্রাম থেকে মা-বাবা-ভাই-ই বা এলেন কেন?

রাতের কথা আস্তে আস্তে সমস্ত মনে পড়তে লাগল আমার। রাতে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি আমি। দরজার দিকে তাকালুম। দরজার দুটো পাল্লার অস্তিত্ব নেই। দুঃস্বপ্ন দেখিনি। সত্যিই ঘটনা ঘটেছে।

মনের কানে শুনতে পেলুম আমি চমনলালের কথা।—শয়তানী ভেল্কি জানে নিশ্চয়—সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে··।

রাত ন'টা। বাংলোর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির ঝমঝমানি নূপুর বাজানো মিঠেল আওয়াজ মনে একটা মধুর আমেজ এনে দিচ্ছে। বাগানের গোলাপবালাদের বারিধারার ছোঁয়ায় সলজ্জ কম্পন দেখছি। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ভেজানো গেটটা কেঁপে উঠলো। মানুষ যেমন দু'হাত দিয়ে গেট খোলে, সেই রকম হওয়ার গতি হয়ে, দুধারে গেটের দুটো পাল্লাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

গোলাপ গাছগুলোকে ঠেলে সরিয়ে সরিয়ে কে বাংলোর দিকে আসছে না?

মলয়দাই তো! টলছে কেন? ওর কী হল?

দৌড়ে ঘর থেকে বাগানে গেলুম। কোথায় কে? কেউ তো নয়! ঘরে ফিরে এলুম।

জ্যাঠাইমা এসে বললেন—মলয় এসেছে রে?

কই? না তো।

তবে আমার ঘরের দরজা ঠেললে কে? তুই?

না তো।

মলয় যেন কতো অসহায় করুণভাবে মা মা বলে ডাকলো। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

আমার তো মনে হয়েছিলো বাগান দিয়ে মলয়দা আসছে।

জ্যাঠাইমাকে বোঝালুম, বৃষ্টি-বাদলের জন্যে পথে কোথায় আটকে পড়েছে হয়তো। ভাবনার কিছু নেই। একটু বাদেই আসবে। বৃষ্টি থেমে আসছে ক্রমশ।

জ্যাঠাইমা শুতে গেলেন।

প্রিয়জনকে কাছে রাখবার প্রবল ইচ্ছাই অবচেতন মনের কোণে সদা-সর্বদা বিরাজ করতে থাকে বলেই বোধ হয় প্রিয়জনের ভাবছবি

তার অভাব পূরণ করে। এক এক রূপ নিয়ে কল্পনার চোখে দেখা দেয়, কানে কথা শোনায়।

কারমাটার এই গোলাপ বাগানটি ঠাকুর্দার আমলের। তিনি বছরে প্রায় তিন চার মাস কাটিয়ে যেতেন এখানে। মনের মতো করে তাঁর হাতে গড়া গোলাপ বাগিচার মাঝখানে সুন্দর বাংলোটি। আমরা আসি বছরে একবার। একটু চেঞ্জের উদ্দেশ্যে। তাও স্বল্প সময়ের জন্যে। এইবারে জ্যাঠাইমা, মলয়দা আর আমি এসেছি। রয়েছি মাসখানেক। এইবার ফিরে যাবো। সামনের সপ্তাহ নাগাত।

মলয়দা একটু উদ্ধত প্রকৃতির। কারো কথা শোনে না। নিজে যা ভালো বুঝবে সেইটাই ঠিক। জ্যাঠাইমা এতে কিন্তু অশান্তি পান খুব। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে ঝগড়া নিয়েই থাকে মলয়দা। আমিও বুঝিয়ে পারিনে!

বৃষ্টির জলের সঙ্গে গোলাপদের মিতালী।দেখা মাথায় উঠলো রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে—মলয়দা না ফেরাতে নানা উদ্ভট চিন্তা ভিড় করতে লাগলো! তাই তো যা গোঁয়াব, কারো সঙ্গে মারপিট করছে না তো কোথাও? জ্যাঠাইমা অবিশ্যি মলয়দা যখুনি কোথাও বেড়াতে বেরোয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেন, কিন্তু মলয়দা রাজী হয় না। আমিও পীড়াপীড়ি করিনে আর।

মলয়দা একটু দেরী করে বাড়ি ফিরলে জ্যাঠাইমা অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরতে বলে দিয়েছেন অনেকবার। কিন্তু কি আক্কেল মলয়দার!

জ্যাঠাইমার ব্যথা বুঝি। ভাবি মলয়দা কী একটু বোঝে না। ছেলের জন্যে মায়ের কী ব্যাকুলতা। আর কবে ও বুঝবে।

সারারাত মলয়দার দেখা নেই। বৃষ্টি মুষলধারে পড়তে শুরু করলো আবার। এই দুর্যোগে কোথায় যাই? কোথায় খুঁজি জ্যাঠাইমার অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়। মালীকে পাঠালুম। যতদুর পারলো, যেখানে যেখানে মলয়দা যেতো, সব জায়গা খুঁজে নিরাশ হয়ে ম্রিয়মাণ মুখে সে ফিরে এলো।

পরের দিন সকালে খোঁজ-খবর অনেক নেওয়া হল চারধারে। কোন সন্ধান পাওয়া গেল না মলয়দার। সে রাতে আবার আগের রাতের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। একটা দমকা হাওয়া। গেট খোলা। জ্যাঠাইমার দরজা ঠেলা। বাগানে টলতে টলতে আসা। মা-মা বলে আর্তনাদ।

বড় বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হতে লাগলো। আমি বসে ভাবছি এখন কি করি। এমন সময় আমার পেছনে থেকে পিঠে কার যেন ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করলুম। কে যেন আমাকে ঠেলে ঠেলে কোথায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। ভেতরে সব অনুভব করছি। কিন্তু কি শক্তি এটি তা বুঝতে পারছিনে। কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে। ভয় যে হচ্ছে তাও না, অথচ কার স্পর্শ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেই টানকে বাধা দিতে পারছিনে। আর বাধা দেবার ইচ্ছেও নেই। আমি এগিয়ে চলেছি। গেট পার হয়ে ক্রমশঃ এগিয়েই চলেছি।

প্রায় মাইল খানেক পথ পার হতে কোরাস গানের আওয়াজ শুনতে পেলুম। ঢোলক বাজছিলো। গান হচ্ছিলো দেহাতি ভাষায়। হাততালি দিচ্ছিল সকলে মিলে। বাতাস তাড়ির গন্ধে ভরপুর।

লোকগুলো তাড়ির নেশায় এতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যে, তাদের পাশ দিয়ে আমি চলেছি, আমার ওপর কারো নজর নেই। সব দেখছি। সব বুঝছি। কিছু ভুল নেই। এগিয়ে চলেছি কেন। এইটাই বুঝতে পারছিনে।

আমার পিঠের হিমশীতল স্পর্শ যেখানে এসে সরে গেলো, চেয়ে দেখি, গাছ ঘেরা নির্জন থমথমে জায়গাটা। ঝোপের পেছনে ভাঙা খাটিয়া আর ছেড়া চট-থলের স্তূপ।

একি। এখানে কেন এলুন? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি! এমন সময় সেই স্পর্শ আবার আমার পিঠে লাগলো। এবারে বাংলো মুখে এগিয়ে নিয়ে এলো। বাংলোয় পৌছুতে স্পর্শ আপনা হতে সরে গেলো।

সকালে উঠে রাতের ব্যাপারটি কি জানবার জন্যে সেই জায়গাটিতে গেলুম। যা রাতে দেখেছিলুম, দিনেও ঠিক তাই দেখলুম। যাক, মাথা তাহলে খারাপ হয়নি।

এবারে জ্যাঠাইমার অবস্থা চরম। দুদিন কেটে গেলো এইভাবে। মলয়দা কলকাতার বাড়িতেও যায়নি। খবরাখবরে কলকাতা থেকেও আত্মীয়স্বজন সব এসে পড়েছেন। সকলেই বিষাদগ্রস্ত। দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে অনুক্ষণ। মলয়দা দুরন্তপনার জন্য বাড়ির সকলের বরাবরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। মলয়দার ওপর একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ছিলো সবার।

তৃতীয় দিন রাতে আবার সেই অবস্থা হল আমার। সেই হিমশীতল স্পর্শ আবার আমাকে নিয়ে চললো আগেকার জায়গায়। যেখানে ভাঙা খাটিয়া আর ছেঁড়া থলের স্তূপ। ঠিক ওই জায়গায়ই হিমশীতল স্পর্শ আমার স্পর্শানুভূতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। এবারে আমার এইভাবে যাওয়া দেখে অনেকেই আমাকে অনুসরণ করেছিলো।

ওই জায়গাটি থেকে ফেরবার চেষ্টা করছি, কানে ভেসে আসতে লাগলো একটা গোঙানির আওয়াজ। যেন সেই ভাঙা খাটিয়া-থলের স্তূপ থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে। আমি কেমন হয়ে গেলুম। আমার মনে হল এই স্তূপের তলায় কেউ চাপা পড়ে আছে নিশ্চয়। স্তূপের কাছে দৌড়ে গেলুম। আশেপাশের উত্তর প্রদেশীয়েরা বাধা দিলে। বললে, বাবুজী! ওসোব সমান হামাদের আছে। বহুত দিন তক্। উহা মত যাবে। সাঁপকা ডর ভী বহুৎ আছে।

ওদের কথা শুনে যতো পেছুতে থাকি, ততো একটা চাপা আর্তনাদ ওখান থেকেই ভেসে এসে আমাকে স্তূপের কাছে আরো টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

স্তূপ সরাবার এক দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো। আমি সকলের কথা, বাধা অগ্রাহ্য করে একটা ভাঙা খাটিয়া টানতেই হুড়মুড় করে আওয়াজ হল। থলেগুলো যেন কোথায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মাটির তলা কি এদের গ্রাস করলো নাকি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না-তো। ওখানে একটা মস্ত গর্ত বলে মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ,

সত্যিই তো।

যতো গর্তের কাছে এগুতে থাকি, ততো সেই গর্তের ভেতর থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই। কাছে গিয়ে দেখি, একটা পুরোনো পাড় ভাঙা ইদারা। আমি চমকে উঠি। স্থানীয়েরা তখনো বলে—ওর ভেতরে সাঁপ আছে। বাবুজী! ও জল কেউ না লেয়, ইসলিয়ে হামিলোগ ভাঙা-টুটা চারপায়া আউর বোরা দিয়ে ঢাকা বনিয়েছে। ইনারা কী মু বন্ধ করকে রাখছে।

আমরা সকলে ফিরে আসছি, আবার সেই হিমশীতল স্পর্শ টেনে নিয়ে গেলো আমাকে ইদারার কাছ অবধি। অন্যরাও আমার সঙ্গে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। আমার সঙ্গে এগোনো, আমার সঙ্গে পেছোনো।

এবারে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম মলয়দাকে ইদারার জলে। আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মুখে-চোখে অসহনীয় যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। আমার বেদনা-কাতর গলা থেকে অস্ফুটভাবে বেরিয়ে এলো—মলয়দা। তুমি এর ভেতর পড়লে কি করে?

জ্যাঠামশাই আমাকে ধরে ফেললেন। আমি তখন পাগলের মতো। ইদারা থেকে কিভাবে মলয়দাকে উদ্ধার করা যায়, সেই চিন্তা পেয়ে বসেছে। আব কোনো দিকে লক্ষ্য নেই। ইদারায় কি করে নেমে তোলা যায় মলয়দাকে?

জ্যাঠামশাই আমাকে কিছুতেই নামতে দেবেন না ইদারায়। জ্যাঠামশাই আর যাঁরা আমার সঙ্গে গেছেন, আমাব কোনো কথাই কেউ বিশ্বাস করছেন না। কেন না তাঁরা কেউ কিছু শুনছেন না, দেখছেন না।

সকলে বোধ হয় ভেবে নিয়েছেন, আমি পাগল হয়ে গেছি। উত্তর প্রদেশীয়দের মধ্যে থেকে মনুয়া সর্দার এগিয়ে এসে বললে, বাবুজী ও ইনারামে ভূত আছে। উধার না যাবে আপনি লোগ! আমাদের ফেরাবার জন্যে তারই বেশী চেষ্টা। আমি মনুয়ার চোখের দিকে যতবার চাইছি, ততবার আমার পিঠে হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করছি। আর মনুয়ার চোখের তারায় মলয়দার মুখ স্পষ্টভাবে ভেসে উঠতে

দেখছি—ইঁদারার কাতর চাউনির মলয়দাকে! আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। বসে পড়লুম। মনে পড়ে গেলো, বাগান থেকে রোজ গোলাপ চুরির জন্যে এই মনুয়ার ছেলেকে একদিন মলয়দা এমন মার মেরেছিলো যে, আধমরা করে ছেড়েছিলো।

কে যেন জোর করে ধরে ইঁদারার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখলো। কে যেন আমাকে দিয়ে বলালো, কাঁটা লাগানো সুদ্ধ দড়ি নিয়ে আসতে শীগ্‌গির। আমাকে ভুলিয়ে বাংলোয় নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা চলছে সবার। অন্য সকলেও ঘাবড়েছেন কিছু। আমি জিদ ধরেছি, কাঁটা-দড়ি আনা না হলে যাব না কিছুতেই। মেজদাকে বলে বাংলো থেকে কাঁটা লাগানো দড়ি আনা হল। বাগানের ইদারায় কিছু পড়লে ওই কাঁটা-দড়ি দিয়ে আমরা তুলতুম।

আমি দড়ি নামিয়ে দিলুম ইদারার ভেতর, পেট্রোম্যাক্সের আলোয় বেশ দেখতে পেলুম, মলয়দা আমার দড়ি ধরলো। উঠতে চেষ্টা করছে। আমি প্রাণপণে টানছি। এবারে মলয়দা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসছে আমার দড়ি ধরে ইদারার জলের নীচে থেকে।

ওপরে কাঁটায় বিঁধে যা উঠলো, তাতে আমার সঙ্গের সকলকেই এক শ্বাসরুদ্ধকারী মর্মান্তিক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হল। মলয়দার মাঝ আঙুলে 'এম' লেখা মিনে করা আংটিপরা ডান হাতখানি। যেন টাঙ্গি দিয়ে কাটা হয়েছে। একে একে সব অঙ্গই তোলা হল ওইভাবে।

মৃত মলয়দার চোখে দেখতে পেলুম জীবন্ত মনুযার মুখখানা স্পষ্ট।

খামারিয়া উত্তরে, সাতপুরা রেঞ্জের ঢালে পাহাড়ী নদী পারিজাত। শীর্ণকায়া পারিজাতের পাথর জাগা জল। কাচ-স্বচ্ছ জলের স্রোতে কিলবিলে মাছগুলো ভেসে চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে। মাথা উঁচু পাথরগুলোর বুক মাড়িয়ে গাঁয়ের লোকেরা আনাগোনা করছে—এপার-ওপার। পারিজাতের কোল ঘেঁষা পাহাড়ে সবুজের ছাউনি—মহুয়া, পলাশ, আতা গাছের সারি। নদী কিনারে অসংখ্য রঙ-বেরঙের নুড়ির জড়াজড়ি। স্বভাবতঃই নুড়ির রঙে মনে রঙ ধরে। যত আছে সবগুলোকে বুকে করে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সূর্য ডুবু ডুবু। আকাশে রঙ, মাটিতে রঙ, নুড়িতে রঙ। একটা, দুটো করে কুড়োচ্ছি—পেছন থেকে হেসে উঠলো মহেশকর।—নুড়ির মায়ায় পাহাড়ী জওয়ান কানা হবে শেষে! আর নয়, ফেরা যাক।

ফেরার পথে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় পাহাড়ের ওপর থেকে নুড়ি বৃষ্টি হতে লাগলো। ওপরে চেয়ে দেখি. কতকগুলো ছেলে নুড়ি নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছে। কোনো রকমে মাথা বাঁচিয়ে পাশ কাটাতে গিয়েও রক্ষে পেলুম না। মাথায় একটা নুড়ি ঠিকরে লাগলো—যেন বুলেট! বসে পড়লুম। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। মহেশকর আহত জায়গা চেপে ধরে, ছেলেদের খুব বকাবকি করতে লাগলো।

ছেলেরা অপ্রস্তুত। সকলে মিলে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টায় মেতে উঠলো। কি একটা পাহাড়ী গাছের পাতা থেঁতো করে, ক্ষতমুখে প্রলেপ দিলে মহেশকর। রক্ত বন্ধ হল। আমিও একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলুম।

ছেলেরা ক্ষমা চেয়ে যে যার গন্তব্যস্থলের দিকে দৌড় দিলে।

যে নুড়ির আঘাতে এই অঘটন, রক্ত লাগা সেই নুড়িটার দিকে

চাইতে, নেবার লোভ হল। অন্য সব নুড়ি থেকে এটা স্বতন্ত্র ধরনের। লাল, নীল, সাদা আভা বেরুচ্ছে তিন ধার থেকে। একটার মধ্যে তিন রঙের খেলা -- বড় বিচিত্র!

হাত বাড়ালুম। পেছনের জামা টেনে ধরলে মহেশকর। রক্তখেকো অলক্ষুণে নুড়িটাকে নিতে হবে না!

চোখে রঙের নেশা আমার। মহেশকরের বাধা কাজ করলে না। নুড়িটা নিলুম। বাড়িতে এসে নুড়িটাকে পরিষ্কার করে, ট্রাংকে রেখে দিলুম।

পরের দিন সকাল।

ট্রাংক খুলে জামা বার করতে হতভম্ব। নুড়িটার লাল আভার জায়গা গভীর লাল হয়ে উঠেছে! ওটাকে টেবিলের ওপর রাখলুম ভালোভাবে দেখবার জন্যে—সত্যি কি ব্যাপার। সারাদিনই কৌতূহলী মন নুড়ির দিকে চোখ ফেরায়। নুড়িটার বিশেষত্ব লক্ষ্য করলুম—সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় লাল, নীল, সাদাটে ভাবটা গাঢ় হয়ে ওঠে। হয়তো নুড়িটার এমন কোনো আকর্ষণী গুণ আছে—যা সূর্যের এই তিনটি রঙকে গভীর করে ধরে রাখবার ছেড়ে দেবার বিশেষ ক্ষমতা রাখে। মনস্থ করলুম, কলকাতায় ফিরে বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরীতে পাঠাবো নুড়িটা।

নুড়ি কাহিনী মহেশকরকে জানাতে সে আমার মতে গুরুত্ব দিলে না। উল্টে বললে—ওসব জ্যান্ত নুড়ি। নানান ভোল পাল্টায়। ঘরে রাখা—কাছে রাখা উচিত নয়। শেষে একটা অনর্থ ঘটবে। দেরী না করে এখুনি ফেলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু নুড়ি ফেলা হল না আমার। মন ওর কথায় সায় দিলে না।

মহেশকর বেরিয়ে গেলো—আশেপাশে অন্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে আসতে। ছুটির মেয়াদ ফুরিয়েছে। আজ দুপুরের ট্রেন ধরতেই হবে কলকাতার।

বেড়াতে নিয়ে এসে মহেশকর তার দেশের সমস্ত দর্শনীয় জায়গাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে—মদন মহলে রানী দুর্গাবতীর দুর্গ থেকে শুরু করে মায় জব্বলপুর শহর। মহেশকর মারাঠী ব্রাহ্মণ যুবক।

মারাঠী হলেও বেশভূষায় পুরোদস্তুর বাঙালী। বাঙালীকে ওর বড্ড ভালো লাগে। ওর সঙ্গে কলকাতা থেকেই ঘনিষ্ঠতা আমার। পরিচয় হওয়া থেকে বরাবরই আমার মতে মত দেয় ও অমত করে না। পার্থক্য দেখলুম খালি নুড়ির ব্যাপারে। ভাবলুম, ওর কাছে আর একথা না তোলাই ভালো।

ফেরার গাড়ি ত্বপুরে—একটা পঁয়তাল্লিশে।

বোম্বে মেলে চড়ে বসলুম আমরা ত্বজনে—মহেশকর আর আমি। সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ভিড় জমে উঠছে এক এক স্টেশনে। কিছুক্ষণের মধ্যে কলকাতার যাত্রীরা মিলে এক গোষ্ঠী হয়ে গেলুম—যেন একান্নবর্তী পরিবারের সকলে। হাসি-খুশি, তাস খেলা, লুডো খেলা এমন কি মহেশকরের মধুর কণ্ঠের ভজনও চলতে লাগলো।

এলাহাবাদে এসে ট্রেন থামলো। রাত আটটা। যাত্রীরা ক্যানটিনে খাওয়া-দাওয়া সেরে কামরায় এসে শোবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ঠাণ্ডা একটু জোর মনে হচ্ছে—অঘ্রানের শেষে শীতের আমেজ। চাদর মাফলার বার করতে গিয়ে স্যুটকেস খোঁজা-খুঁজির ধুম পড়ে গেলো মহেশকরের।

মহেশকরের যতো রাগ আমার ওপর—নুড়িটাকে ফেলে দিইনি বলেই ওর স্যুটকেশ চুরি গেলো। ভিড়ের মধ্যে কোন্ ফাঁকে—কোনো স্টেশনে কেউ সরিয়ে নিয়ে গেছে। অলক্ষুণে নুড়ি সঙ্গে থাকায়—এই সর্বনাশ ঘটলো।

আমার মুখে চাবি। অবস্থা শোচনীয়, কলকাতায় পৌঁছুলে বাঁচি। যে রকম ক্ষেপেছে মহেশকর—এখুনি না আমার ট্রাংকটাই ফেলে দেয় জানলা গলিয়ে।

রাত আটটা কুড়ি। ঝকঝক আওয়াজ তুলে কানফাটা হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেন ছাড়লে। ধড়াস ধড়াস শব্দে ত্ব পাশের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। যাত্রীরা যে যার নিজের দিকে জানলার সার্টার নামিয়ে দিলেন—হিমেল বাতাস ঢুকছে।

রাত নটা। মির্জাপুর স্টেশনে পৌঁছুতে এখনো অনেক দেরী।

হঠাৎ জানলায় টোকার আওয়াজ—টক-টক-টক। আমার দিকের জানলাটাতেই টোকা। অন্য যাত্রীরা কান খাড়া করে শুনছেন, কিন্তু একেবারে চুপচাপ সব। টোকা থামবার কোনো লক্ষণই নেই—এক নাগাড়ে চলেছে। অগত্যা টোকার ডাকে সাড়া দিতে হল আমাকে—কে ?

—হম ফুটবোর্ড মে খড়া হ্যায়। গির জায়েঙ্গে। দরওয়াজা খোল দিজীয়ে, সামনা স্টেশন পর উতরেঙ্গে। মনে হল লোকটা এক নিশ্বাসে এতোগুলো কথা মুখস্থের মতো বলে গেলো—কোনো কমা, ফুলস্টপের বালাই না রেখেই।

ভেতরের যাত্রীরা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—খুলবেন না! খুলবেন না! বলুন—জায়গা নেই, অন্য কামরা দেখতে! যতো সব উপদ্রব—নিশ্চিন্তে ঘুমোবো মনে করলে হবার যো নেই!

সহযাত্রীদের কথা মানতে বাধ্য হলুম—কেন না মহেশকরের কটমটে চাউনিতে বুঝলুম—সেও না-দেরই দলে।

—জায়গা নহী। দুসরে কামরা দেখিয়ে!

টোকা-কথা একদম নিশ্চুপ। আর কোনো সাড়া-শব্দও পেলুম না—লোকটা অপর কামরায় গেছে হয়তো। নিশ্চিন্তে তন্দ্রার ঘোরে ঢলে পড়লেন যাত্রীরা। খালি মহেশকরের চোখ দুটো জ্বলছে—স্যুটকেস চুরির শোক ভুলতে পারছে না। আর আমার হচ্ছে উপরোধে ঢেঁকি গেলা—বেচারীর ওপর সহানুভূতি দেখানোর জন্যে জোর করে চেয়ে থাকা। চোখ ঘুমে ঢুলে আসছে।

মির্জাপুর স্টেশন।

দরজা-জানলাগুলো ভালো করে দেখে নিলে মহেশকর—ঠিক মতো বন্ধ আছে কিনা। বাইরের কোনো লোক না আর ঢুকে পড়ে—তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে ঘুমিয়েছেন যাত্রীরা।

মির্জাপুর স্টেশন ছেড়ে ধীরে ধীরে গতি বাড়ালো বোম্বে মেল। অন্ধকারের বুক তোলপাড় করে ছুটে চললো। আমার দিকের জানলায় টোকার আওয়াজ শুরু হল আবার—ঠিক পূর্বের মতো!

আমি অবাক! এতোক্ষণেও সেই লোক কি—! জিজ্ঞেস করলুম—কোন? সেই আগেকার গলায় মুখস্থ কথার উত্তর! বিরক্ত হয়ে জানালুম—আগের স্টেশন চলে গেলো-তবুও নামা হল না কেন? দরজা খোলা হবে না কিছুতেই।

দৃঢ়কণ্ঠের নির্ভীক উত্তর এলো—জরুর খোলনা পড়েগা! কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা দড়াম করে চমকে দেওয়া শব্দ হল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি হয়ে গেলো কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না—কেমন করে আমার জানলা খুলে, লোকটা লাফিয়ে ভেতরে পড়লো! যাত্রীদের তন্দ্রা ভাঙলো। হৈ-হৈ করে উঠলেন সমস্বরে সকলে।—ডাকাত! ডাকাত!

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মহেশকর লাফিয়ে উঠে চেপে ধরলো আগন্তুককে। আগন্তুক স্যুট পরা বলিষ্ঠ যুবক। স্পষ্ট গলায় বললে—ম্যায় রাজপুত হুঁ। জানকো পরোয়া করতে নহীঁ। ভালো করেই যাত্রীদের জানিয়ে দিলে—তার কাছে রিভলবার আছে—চেন টানলেও কেউ কিছু সুবিধে করতে পারবে না! পেছনে দল আছে বিরাট। শিস দিলে আগন্তুক। লাঠি-বন্দুক হাতে যুবকেরা জানলা গলে গলে লাফিয়ে পড়তে লাগলো।

যাত্রীদের হৃৎকম্প। অগ্রানের শেষে মাঝ পৌষের রক্তজমা কাঁপুনি—দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি। যার যা আছে—গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি সব খুলে দিতে লাগলেন, তুলে দিতে লাগলেন অতিথিদের হাতে। বিনিময়ে প্রাণভিক্ষা সবার।

চললো অরাজকতা। একটা নির্দয় ঝড় বয়ে যাচ্ছে—জিনিসপত্র সব তছনছ করছে আগন্তুকরা! পাঁচ বছরের ছেলেকে বুকে চেপে ধরেছেন মা। ছেলের গলার হার ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। মায়ের বুক থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে গলিয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছে—কি আছে মায়ের কাছে আরো—নেবার জন্যে। মা বাক্স-প্যাঁটরা খুলে সর্বস্ব তুলে দিচ্ছেন ডাকাতদের হাতে—খোকাকে বাঁচাবার জন্যে—ফিরে পাবার জন্যে। তবুও কি রেহাই আছে সব দিয়েও? পৈশাচিক

উল্লাসে হেসে উঠছে দুর্বৃত্তরা। ছেলেটাকে ছুঁড়ে মারলে কামরার ভেতর। মাথা ফেটে রক্তারক্তি। মা আছড়ে পড়লেন ছেলের বুকের ওপর।

বাপ দাঁড়িয়ে—নিশ্চল পাথর মূর্তি। বুকের ওপর ছুরি উঁচিয়ে রয়েছে একজন—নড়েছো কি, এখানেই খতম। আমার বুকের ওপর অন্যজনের বন্দুকের নল। প্রায় যাত্রীরই এই অবস্থা। কেউ কেউ ভয়ে ত্রাসে বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়েছেন। অনেক মা-মেয়েদের নাক-কান ছিঁড়ে তাজা রক্ত ঝরছে—কানপাশা, নাকছাবিই হয়েছিলো কাল! কারো ঠোঁট নড়াবার অধিকার নেই, কথা কইবার উপায় নেই। চিরকালের জন্যে কথা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে।

বিপদ মুহূর্তে শোনা কথা সংস্কারের রূপ পেলো। মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কেবলই মনে হতে লাগলো—কি কুক্ষণেই এনেছিলুম তিন-রঙা নুড়ি! মহেশকরের কথা ফলে গেলো। আমার জন্যেই এতোগুলো লোকের ধন-প্রাণ—

বজ্রগম্ভীর আওয়াজ কানে এলো—শা—দরওয়াজা খোলা নহীঁ তুম—ইয়াদ হ্যায়? তুমহারি জান পহলে খায়েঙ্গে। ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো সেই যুবকের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ আক্রোশে ফেটে পড়ছে।

নিরুপায় আমি। মৃত্যু চোখের সামনে এগিয়ে আসছে। তার তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেছে—প্রত্যক্ষ করছি।

—নিকালো ক্যা হ্যায়! যা কিছু ছিলো ঘড়ি, আংটি, টাকা-পয়সা—সব কেড়ে নিলে আগন্তুকরা। সমস্ত রাগ আমার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওদের। আমার জিনিসগুলো কোথায় জানতে চাইলে—ইশারায় দেখিয়ে দিলুম—পায়ের তলায়। কথা কইবার শক্তি নেই। ট্রাংকের চাবিটাও থরথরে কাঁপা হাতে ঠিক করে দিতে হল।

ট্রাংক খুলেই রাজপুত যুবকটি চীৎকার করে বলে উঠলো—সুরইয়ো দেওতাজী! আমার চোখকে-কানকে ঠিক মতো বিশ্বাস করতে পারলুম না। স্বপন দেখছি নাকি! মহেশকরের সেই অলক্ষুণে নুড়ি বার করে, তিনবার কপালে ঠেকোলে রাজপুত যুবক। অন্য সাগরেদ-

রাও তাকে অনুসরণ করলে।

অবিশ্বাস্যভাবে সকলের সব কিছু ফেরত দিয়ে ট্রেন থেকে এক এক করে নেমে গেলো আগন্তুকরা। যাবার সময় আমার চোখের সামনে নুড়িটাকে তুলে ধরলে রাজপুত যুবক—সুরইয়ো দেওতাজী জিন্দগী ওয়াপস কর দিয়ে সব আদমীকো। নুড়িটাকে সঙ্গে নিয়েই চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লো রাজপুত যুবক।

মানুষ প্রমাণ পাথরের বাক্সের ভিতর বসানো হল রাজমলকে। পাথরের ঢাকনায় ঢেকে দিল দুজন মজবুত শরীরের মানুষ। আড়াআড়ি কোনাকুনি শক্ত কাছি দিয়ে বাঁধল ওরা বাক্সটাকে। মুখ বন্ধ বাক্সের ডানদিকের গিঁট দেওয়া বাড়তি কাছি দুটো ধরল দুজনে। বাঁ দিকটায় ধরলেন পূরণদাস আর ওঁর স্ত্রী।

পূরণদাসের মুখের ভাব একেবারে স্বাভাবিক। ওঁর স্ত্রীরও তাই। ওঁদের কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ল না আমার। লোকের মনের ভাব মুখে ফুটে ওঠে। বাইরে দেখে ভেতর বোঝা যায়। বাইরে ওঁরা সম্পূর্ণ নির্বিকার। ভিতরটাও ঐ ধরনের হবে নিশ্চয়।

বজরা থেকে পাথরের বাক্সটা ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে নামিয়ে গঙ্গার বুকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর অতল তলে তলিয়ে যাবে মানুষ সুদ্ধ বাক্সটা।

বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল আমার।

মাঝ গঙ্গায় বজরাটা দুলতে লাগল। মাঝিরা দাঁড় টানতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তরমুখে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটু। পূরণদাস ইশারায় নির্দেশ দিয়েছিলেন ওদের।

এসব ছাপান্ন সনের কথা। দশেরার সন্ধ্যেয় ঘটেছিল ব্যাপারটা। তখন আমি বজরায়। দাঁড়িয়েছিলুম পূরণদাসের পাশে। ভাবছিলুম রাজমলের কথা।

রাজমলকে দেখেছিলুম আমি বার তিনেক। প্রথমবারের দেখাটা যেন কি-রকম কি-রকম। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার জলজ্যান্ত মানুষকেই চোখের সামনে দেখেছিলুম। দেখেছিলুম বেশ খানিকক্ষণ ধরে। চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দেখেছিলুম আর কথা শুনেছিলুম ওঁর মুখ থেকে। ওঁর হাসিমুখের মিষ্টি কথা আর স্নিগ্ধ চাউনি আমাকে মুগ্ধ

করেছিল খুব।

পূরণদাসের ঘরেই প্রথম দেখা হয় রাজমলের সঙ্গে আমার। পূরণদাস রামাপুরার বাড়িটার উত্তরের অংশ ভাড়া নিয়েছেন। আমরা তখন দক্ষিণ দিকটায় থাকি। ওঁরা আসবার পর বাড়ির তুটো দিকই প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরে উঠল। মাঝের পার্টিশানের দরজা খুলে, উত্তরের লোকের দক্ষিণে আর দক্ষিণের লোকের উত্তরে যাতায়াত চলতে লাগল ঘন ঘন। তুটি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেরী লাগল না খুব বেশী দিন।

পূরণদাসরা সিন্ধী।

দেশের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ থেকে চলে এসেছিলেন ওঁরা সাতচল্লিশ সনের পরে। সিন্ধু দেশের রহরকা থেকে এসে—প্রথম প্রথম ঘুরেছিলেন অনেক জায়গায়। পরে কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন। ওঠেন রামাপুরায়।

ওঁর অমায়িক ব্যবহারে পাড়াপ্রতিবেশীরাও খুশি। ভদ্রলোক ভাগ্যগুণে স্ত্রীও পেয়েছিলেন বটে। স্বামীর গুণে গুণবতী স্ত্রী। একেবারে রাজযোটক মিলন তুজনের। যতদিন ছিলেন ওঁরা রামাপুরার বাড়িতে মতান্তর-মনান্তর হতে দেখেনি কেউ কোনো দিন ওঁদের মধ্যে।

অন্যেরা যেমন নিজেদের কাজে-কর্মে পালে-পার্বণে ওঁদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতেন বাড়িতে তেমনি ওঁরাও ওঁদের যে কোনো উৎসবমুখর দিনে অন্যদের অনুরোধ করে ডেকে নিয়ে আসতেন বাসায়।

রাজমলের জন্মতিথিতে এক রকম জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিলেন পূরণদাস আমাকে। যত্ন করে বসিয়েছিলেন পূরণদাস ঘরে। সেদিন আশ্বিনের বিজয়া দশমী আর দশেরার আনন্দমেলা বসেছে ঘরে-বাইরে।

পূরণদাসের ঘর ভরে গেছে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনে। পুব দিকটায় ফুলের সিংহাসন তৈরী করা হয়েছে। সিংহাসনের ভিতরের চৌকিটায় লাল ভেলভেটের আসন পাতা। লাল সাটিনের ওয়াড় পরানো

তাকিয়া দুটো দুপাশে। সামনে পদ্ম আল্পনার ওপর মঙ্গল ঘট। মঙ্গল ঘটের কাছাকাছি মাটির তিন থাকের যজ্ঞকুণ্ড। ধূপধুনোর গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে ঘরখানা। সুন্দর পরিবেশ।

রাজমলের জন্মতিথি। শুনলুম, তিনি ট্রেনে করে আসছেন। স্টেশন থেকে লোক খবর এনেছে, ট্রেন আসতে দেরী হবে। এতক্ষণ ধরে ঘর-বার ছুটোছুটি করছিলেন আগন্তুকের আসবার আশায় পূরণদাস। নিরাশ হয়ে মেঝেয় বসে পড়লেন ধুপ করে। বাঁ-হাতের রিস্টওয়াচটার দিকে তাকাতে লাগলেন বার বার। তিথি পালনের লগ্নক্ষণ উত্তীর্ণ হতে আর বেশী দেরী নেই।

শুভ কাজ সেরে ফেলতে অনুরোধ করলেন পুরোহিতকে। ······ জ্বলে উঠল যজ্ঞকুণ্ডের আগুন।

যাঁর জন্মতিথিতে এসেছি আমি—তাঁর ইতিবৃত্তান্ত তেমন কিছুই জানি নে। পূরণদাসের মুখে শুনেছি শুধু—তিনি মহানলোক। পরিব্রাজক। একাশী বছরের বৃদ্ধ। দেখলে আনন্দ পাওয়া যায় খুব। এর বেশী আর কিছু বলেননি পূরণদাস। আমাকেও কোনো প্রশ্ন করতে না দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে টেনে নিয়ে এলেন ওঁর ঘরে।

যজ্ঞ দেখছি আর বসে বসে ভাবছি আমার আসবার অনিচ্ছার দরুনই হয়ত রাজমলের ট্রেন দেরীর বিপত্তি ঘটেছে। এ ভাবনাটা অমূলক জানি। তবুও মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারছে থেকে থেকে। কিছুক্ষণ পরে ভুল ধারণার হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পেয়ে গেলুম আমি হঠাৎ।

ঘরের বাতাসে দেয়ালে পুরোহিতের আহুতি দেবার মন্ত্র ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলুম আমি। সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো দেখলুম—ফুলের সিংহাসনে বসে আছেন একটি সৌম্য দর্শন তরুণ। ভালোভাবে তাকাতেই আমার স্বর্গস্বপ্ন ভেঙে তছনছ হয়ে গেল নিমেষে। নিজের ভুল শোধরাবার জন্য মাথা থেকে একটা যুক্তিও বার করে ফেললুম সঙ্গে সঙ্গে। একটা ভুল ধারণা নাকচ করতো নতুন করে আর একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল বোধহয় আমার

অবচেতন মনই।—আমার জন্যই রাজমলের ঠিক সময় আসা হল না—ভেবেছিলুম। তাই রাজমল এসেছেন আমার কল্পনার চোখে। কল্পনার আতিশয্যে একাশী বছরের বৃদ্ধকে যুবক করে দেখিয়েছে একেবারে।

কিন্তু এ যুক্তিও আমার মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়ে গেল ঘণ্টাখানেক বাদে।

এলেন রাজমল।

অবাক চোখে দেখলুম একবার দুবার—বারবার। আমার কল্পনার চোখে দেখা ফুলের সিংহাসনে বসা সেই যুবক। আমার দিকে তাকিয়েই মৃদু মৃদু হাসছেন রাজমল। রাজমলকে দেখে সত্যিই একটা অজানা আনন্দে ভরে গেছল আমার ভেতরটা। কিন্তু একটা সংশয়ের দানা বেঁধেও উঠেছিল। একাশী বছরের রাজমল। অসম্ভব। হয়ত আমার শুনতে ভুল হয়েছিল। একুশকে একাশী শুনেছি। নয়ত পূরণ-দাসেরই মুখ দিয়ে একুশের জায়গায় একাশী বেরিয়ে গেছে। আনমনা হলে অনেক সময় মনের কথা মুখে বেরোয় অন্যরকম।

সন্দেহের দোলায় দুলতে রাজী নই আমি মোটে। মনের তলায় সন্দেহ পোষা থাকলে সমস্ত শান্তি নষ্ট করে আমার। তাই অশান্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাজমলের বয়েস সম্বন্ধে আলোচনা করলুম পরে পূরণদাসের সঙ্গে।

আলাদা ঘরে নিয়ে গেছলেন পূরণদাস আমায়। একান্তে বসে অজানা লোকের রহস্যের কথা বলেছিলেন এক এক করে।

—সেদিনটা ভয়ঙ্কর ছিল আমাদের কাছে। ভুলতে পারব না উনচল্লিশ সনের পয়লা নভেম্বর।

সন্ধ্যের মুখোমুখি। রুক স্টেশনে ট্রেন থামল। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীরা যে যার প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালাতে লাগল এদিক-ওদিক। ট্রেন থেকে নামছিলেন সন্ত কাঁনওয়াররাম রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন স্টেশনে। তিনি সকলের মঙ্গল কামনা করতেন। সকল ধর্মের লোকের অন্তরে সাক্ষাৎ ঈশ্বর দেখতেন—

নিজের দেশের সঙ্কীর্ণমনা অবুঝ লোকের আক্রোশে এইভাবে শেষ হয়ে গেলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন পূরণদাস।

রহরকীতে তার জন্য প্রার্থনা চলেছিল তেরো দিন ধরে। রোজ যেতুম আমরা দেউড়ী শাহিলীতে—যে ভজন ঘরে তাঁর দেহভস্ম রাখা ছিল। সব বয়সের লোকই আসতো প্রার্থনা করতে। অনেক সাধু-সন্তরাও আসতেন। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতুম আমি একজনকে বিশেষ করে। তিনি কাঁনওয়াররামের দেহভস্ম রাখা বেদীর ঠিক পিছনে রোজ একই সময়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সবচেয়ে বেশী অবাক লাগত আমার কাছে—আমার ছেলেকে দেখা নিয়ে।

অলোকনাথ তখন বছর পাঁচেকের। ও একটু ভাবুক গোছেরই ছিল। স্থির-ধীর হয়ে বসে, চোখ বুজে প্রার্থনা করত। ভজনে সবার সঙ্গে সুরেলা গলা মেলাত। লোকটি অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন ওঁর দিকে। কিন্তু প্রার্থনা-ভজন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতেন যে প্রণাম করবার কেউ সুযোগ-সুবিধে পেতুম না।

একদিন সুবিধে পেলুম। তেরোদিনের শেষ দিনে। বৃদ্ধ লোকটি সেদিনে আর বেরিয়ে গেলেন না তাড়াতাড়ি। বরং হাসতে হাসতে আমাদের কাছে এসেই দাঁড়ালেন। আমাদের মনের ইচ্ছে বুঝতে পেরেছিলেন যেন তিনি। প্রণাম করলুম আমরা স্বামী-স্ত্রীতে। প্রণাম করল অলোকনাথ। হাসলেন একটু বৃদ্ধ। কিন্তু কোনো আশীর্বাদের কথা উচ্চারণ করলেন না মুখ থেকে। মাথায় হাতও রাখলেন না কারো।

বৃদ্ধের চেহারা ভাবগতিক দেখে কেবলই মনে হত—খুব ভক্তলোক। অনেক ভক্তলোকের কাছে প্রণাম করিয়েছি ছেলেকে—আশীর্বাদে রোগমুক্তি হবে বলে। এঁকে দেখে ঐ একই কারণে আশীর্বাদ নেবার লোভ জেগে উঠেছিল ভিতরে। কিন্তু হতাশ হতে হল।'

উনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন সাহস করে সামনে এসে দাঁড়ালুম। জোড় হাতে বললুম, হবার পর থেকে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে

অলোকনাথের। ওকে একটু আশীর্বাদ করে যান!

থমকে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। গম্ভীর গলায় বললেন, কি আশীর্বাদ চাও?

বললুম, আপনাকে বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। তবে আপনি যদি দয়া করে বলেন 'আওরজা কঁনতুই' দীর্ঘজীবি হও, তাহলে ও অসুস্থ হয়ে পড়লেও, ওর জীবনের বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভুরু কোঁচকালেন, ছেলেটার দিক থেকে মুখ ফেরালেন উনি। দৃঢ়কণ্ঠে শোনালেন, একথা কিছুতেই তিনি বলবেন না। বলবেন না কেন? প্রশ্নটা অসহ্যভাবে বিঁধতে লাগল বুকে। অশুভ আশঙ্কা পেয়ে বসল আমায়। তবে কি ও বাঁচবে না বেশী দিন!

স্ত্রীর দিকে ফিরে দেখি ছু চোখ জলে ভরে উঠেছে ওর। ছেলেটা তিনজনের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। স্থির থাকতে পারলুম না আমি। লুটিয়ে পড়লুম পায়ে। ওকি আমাদের কাছে সত্যি থাকবে না? বলুন। বলে যান আমায়!

আমার চোখের জলে পা ভিজল তাঁর। মন ভিজল কিনা বুঝতে পারলুম না। স্ত্রীর দিকে তাকালেন। হাপুস নয়নে কাঁদছে স্ত্রী। ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরেছে। মা-বাবার অবস্থা দেখে ছেলেটা ফোঁপাচ্ছে ওর ডাগর চোখের ছু কোণ বেয়ে টস-টস করে জল পড়ছে। কান্না দেখে কাঁদছে ও ব্যাপার কিছু না বুঝেই।

স্ত্রীর বুক থেকে আচমকা টেনে নিলেন ছেলেটাকে নিজের বুকে বৃদ্ধ। গায়ের চাদরের খুঁটটা দিয়ে মোছালেন ছু চোখ। চিবুক ধরে আদর করে বুক থেকে নামিয়ে দিলেন মায়ের কাছে। তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে জানালেন, ঠিক সময়ে ঠিক দিনে আসবেন উনি।

তখন নয় পেরিয়ে দশে পা দিয়েছে সবে অলোকনাথ। হঠাৎ কাল জ্বরের আক্রমণে অস্থির হয়ে পড়ল ও একদিন। একেবারে বেহুঁশ! এরপর সময় সময় সচেতন হয়েছে। আবার অচেতনও থেকেছে মাঝে মাঝে। এইভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। ছ মাসে ক্ষীণ থেকে আরো ক্ষীণ হয়ে পড়ল অলোকনাথ। প্রাণটুকু

রয়েছে কোনক্রমে। খিদে নেই বললেই চলে। জলে পর্যন্ত অরুচি।

এরকম অসহায় অবস্থায়—আমাদের স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই মনে পড়ত কেবল বৃদ্ধের কথা। আসবেন বলেছিলেন—এ অসময়ে না এলে আর আসবেন কবে।

অন্তরের ডাক শুনে যেন অন্তর্যামীই অলোকনাথের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মুমূর্ষু অবস্থায়। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ অলোকনাথের। অলোকনাথের চারপাই-এর পাশে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। পাশের চারপাই-এ শুয়েছিলেন তিনি। যে কদিন ছিলেন, শুয়েই থাকতেন। কেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন আলোকনাথের দিকে। জ্বরে পড়লেন তিনিও। জ্বরের ঘোরে অনেকবার বলেছেন, সত্তর বছর পার হয়ে গেল। আর তো মোটে বারো বছর হাতে আছে। ঠিক আছে অলোকনাথ। ভয় নেই।

তাঁর হেঁয়ালী কথা তখন বুঝিনি। বুঝলুম দশেরার সন্ধ্যায়। শেষ নিশ্বাস ফেললেন তিনি। মুমূর্ষু অলোকনাথ চোখ খুলল। জল চাইল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

অলোকনাথ রয়ে গেল। চলে গেলেন বৃদ্ধ। অলোকনাথ বেঁচে উঠুক চেয়েছিলুম। বৃদ্ধকে হারাতে হবে এটা চাইনি। এটা কল্পনার বাইরে ছিল। একটা মহাপুরুষের প্রাণ এভাবে আমাদের জন্য গেল—আপসোসের অন্ত ছিল না আমাদের।

বৃদ্ধ মহাপুরুষ আমাদের কাছে। কিন্তু তাঁর নামধাম জানি নে। জানবার চেষ্টা করেছিলুম অনেক সময়। জিজ্ঞেস করলে—তিনি অন্য প্রসঙ্গ টেনে এনে এড়িয়ে যেতেন। আমাদেরও মুখ যেন বন্ধ হয়ে যেত। জানবার স্পৃহা চলে যেত।

অবিশ্যি বৃদ্ধের নামধাম জানতে পেরেছিলুম আমরা মৃত্যুর দিন পনেরো পরে। বলেছিল অলোকনাথ।—আমি রাজমল। আমি পরিব্রাজক। আমাকে আটকাবার চেষ্টা কর না। চলে যাব আমি।

এর পর শত চেষ্টা করেও আটকাতে পারিনি আমরা। দেহটা

ছিল বটে অলোকনাথের কিন্তু আচার-ব্যবহার কথাবার্তা সব অন্য মানুষের। বৃদ্ধ রাজমলের।

যাবার সময় বলে গেছলেন অলোকনাথের দেহবাসী রাজমল—প্রতি বছর আসবে। এই দিনে এই সময়। এই তিথিটা আমার আর একটা নতুন জন্মতিথি। যেখানেই থাকো তোমরা—যেখানেই থাকি আমি দেখা হবেই আমাদের।

দেখা হয় রাজমলের সঙ্গে আমাদের ওঁর জন্মতিথিতে। ওঁর দেহ না এসে পৌঁছুতে পারলেও, সে সময়টায় আমাদেব কাছেই স্পষ্ট দেখতে পাই ওঁকে। এরকম ঘটেছে বহুবার। উনি বলেন, ওরকম সময়ে—উনি নাকি ঘুমিয়ে পড়েছেন অনেক দিন। এবারেও ট্রেন লেট হওয়ায় ঘুমুচ্ছিলেন তখন কামরায়। বৃদ্ধ রাজমলের বয়েসের হিসেবেই অলোকনাথের দেহবাসী রাজমলের বয়েস চলছে। সত্তর আর এগারো একাশী। আর এক বছর মাত্র পরমায়ু। সামনের বছরের জন্মতিথিতে পূর্ণ হবে সেটা।

রাজমলের ব্যাপার শুনতে শুনতে ওঁর বয়সের সংশয় আমার মন থেকে মুছে গেছল। পূরণদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা বেদনা অনুভব করেছিলুম বুকের তলায়। তবুও ছেলের দেহটা আছে এখনো—সেটাও কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়ে আসছে!

পরের বছরে পূরণদাসের ঘরে এসেছিলুম আমি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এসেছিলুম জন্মতিথির দিনে। সব জানি বলে সবারই মুখের দিকে তাকাচ্ছিলুম। কারো মুখে কোনো বিপদের-শোকের চিহ্ন লক্ষ্য করলুম না। আগের বারের চেয়ে এবারে রাজমলকে বেশী হাসিখুশি দেখছি। দেখছি রাজমলের মুখের ছোয়া লেগেছে পূরণদাস আর তাঁর স্ত্রীর মুখেও।

যজ্ঞের আগুন জ্বলবে এবার। কাছে ডাকলেন রাজমল পূরণদাসকে। হাসতে হাসতে বললেন, দেহটাকে মাঝ গঙ্গায় ডুবিয়ে দেবে। পাথরের বাক্স করে জল সমাধি দেবে।

হাসি মুখে, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন পূরণদাস।

যজ্ঞের আগুন জ্বলল। নিভল শান্তিজলে। নিস্পন্দ-নিষ্প্রাণ হয়ে গেল ফুলের সিংহাসনে বসা দেহটা। চলে গেলেন রাজমল।

ফুলের শয্যায় শুইয়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হল মৃতদেহ। কাঁসরঘণ্টা বেজে চলেছে এক নাগাড়ে। শাঁখ বাজছে মাঝে মাঝে। 'রাজমলজী কী জয়' ধ্বনি উঠছে সকলের কণ্ঠে।··· বজরায় তোলা হল মৃতদেহ। ধীরে ধীরে মাঝ গঙ্গায় এসে থামল বজরা। রাজমলের নির্দেশ মতো সব কাজ করা হল।

আমি দেখছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মৃতদেহ নিয়ে নামছে পাথরের বাক্সটা। অন্য লোকের সঙ্গে পূরণদাস আর ওঁর স্ত্রী বাক্সটার দড়ি ধরে মাঝ গঙ্গায় নামাতে সাহায্য করছে। গঙ্গার জলে ডুবল বাক্সটা।

রাজমলের জয়ধ্বনি দিলেন একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী। হাঁটু গেড়ে বসলেন ওঁরা বজরার ওপরে। ফুল হাতে নিয়ে, চোখবুজে অঞ্জলি দিতে লাগলেন উত্তরবাহিনী গঙ্গার বুকে।

পাড়ের সারবন্দী দেবতা মন্দির থেকে সন্ধ্যে-আরতির বাজনা ভেসে আসতে লাগল বাতাসে।

ভুজ শহরে যখন ছিলুম তখন দুটি অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওদের দুজনের মধ্যে একজন পুরুষ অন্যজন স্ত্রীলোক।

সেদিন মাঘের গোধূলি বেলা। সবে মাত্র সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিম আকাশ তখনো আবীর লালে রাঙা হয়ে রয়েছে। কেন জানিনে— বেড়াতে বেড়াতে ডাঃ শেঠের চেম্বারের দিকেই মনটা টানতে লাগল বার বার।

ভুজ শহরে আসবার কিছুদিন পরেই অসুখবিসুখের ব্যাপার দিয়ে ডাঃ শেঠের সঙ্গে পরিচয় প্রথম। প্রয়োজনে যেতুম ওঁর ওখানে মাঝে মাঝে। সদালাপী লোক ডাঃ শেঠ। গেলে সমস্ত রুগী দেখা শেষ না করা পর্যন্ত বসিয়ে রাখতেন অবসর সময়ে একটু গল্পসল্প করবেন বলে। গল্পপ্রিয় ডাঃ শেঠকে গল্প শোনাতুম আমি প্রায় বেশী দিনই। তিনিও আমাকে শোনাতেন মাঝে মাঝে। গল্প হত আশ্চর্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার নিয়ে।

রাত সাতটার আগে চেম্বারে আসেন না ডাঃ শেঠ। সন্ধ্যের মুখোমুখি তো কোনো দিন আসতে দেখিনি আমি তাঁকে। অথচ অসময়ে চেম্বারের দিকে মনের টানটা কেমন কেমন ঠেকল নিজেরই কাছে। যাব কিনা ভাবছি। শেঠ নেই, কার কাছে যাব? হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে দেখি, হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসছে শেঠের কম্পাউণ্ডার।

আমার কাছে এসে একগাল হেসে জানাল, না দেখা হলে বাড়ি অবধি দৌড়তে হত। শেঠের জরুরী তলব—এখুনি যেতে হবে। বিশেষ দরকার আছে নাকি। চেম্বারে অপেক্ষা করছেন তিনি। এসময় এমন কি দরকার থাকতে পারে শেঠের—বুঝতে পারলুম না। অবাকই হলুম একটু।

এলুম চেম্বারে।

একা বসে আছেন শেঠ। রুগীপত্তর নেই কেউ। আমাকে দেখে খুশির আমেজ লাগল চোখেমুখে। সামনের চেয়ারটায় বসতে বললেন। টেবিলের ওপর তুটি ফুলদানিতে লাল গোলাপের তোড়া তুটি। গোলাপের মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়।

বসে বসে দেখছি শেঠকে। এ শেঠ যেন দেখা শেঠ না। অন্য জগতের অন্য মানুষ। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন তিনি থেকে থেকে। চমক ভাঙলে, বাঁহাতের রিস্টওয়াচটা দেখে নিচ্ছেন একবার করে। দরজার দিকেই নজরটা বেশী তাঁর। মনে হল আর কারো আসবার প্রতীক্ষায় বড্ড বেশী চঞ্চল।

প্রতীক্ষার অবসান হল শেঠের।

এলো তুজনে। একটি সুবেশা সুন্দরী তরুণী আকাশী রঙের সিল্কের ওড়নায় মুখ ঢেকে প্রবেশ করল চেম্বারে প্রথমে। তার পিছনে প্রবেশ করল একটি ছিমছাম গড়নের সুদর্শন যুবক। পরনে বিয়ের সাজ সুরুয়াল আচকান। মাথায় জরির কাজ করা সাফা।

আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলেন শেঠ। চেয়ার ছেড়ে উঠে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যুবকটিকে। যুবক-যুবতীকে তুটি সোফায় বসিয়ে চোখের ইশারায় কি যেন বললেন ওদের। তারপর ফিরে তাকালেন আমার দিকে। ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ শান্তিলাল এ রতনবাঈ।

আমরা তিনজনে এক এক করে নমস্কার প্রতি-নমস্কার বিনিময় করলুম। পরিচয় করাবার সময় আমার নামের পূর্বে অদ্ভুত ঘটনার অনুসন্ধানী বিশেষণটি কেন উল্লেখ করলেন শেঠ বুঝলুম না। বুঝলুম পরে। শান্তিলালের কথাবার্তা শোনবার পর।

উপযাচক হয়েই শেঠ শান্তিলালকে তার জীবনের রহস্যময় অধ্যায়টি শোনাতে বললেন আমাকে। শেঠ ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন— এতক্ষণে স্পষ্ট হল।

ডাঃ শেঠের দৌলতে শান্তিলালের জীবনের আশ্চর্য ঘটনা শুনতে পেয়েছিলুম সেদিন আমি।

শান্তিলালের কথা শুনতে শুনতে আমি যেন কোন রহস্যে ঘেরা অজানা রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। বলেছিল শান্তিলাল—আমার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু এম-এ পাশ করবার পর। তার আগে নয়। আমি দেখলুম একটি মাত্র মেয়েই আমাকে অনুসরণ করে চলেছে অনেক ক্ষেত্রে। কেন বুঝে উঠতে পারতুম না।

প্রথম প্রথম মেয়েটির সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করতুম। কি জানি কেউ না আমাকেই ভেবে বসে শেষে মেয়েপাগল। মেয়েটিকে ঘরে আনবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে নানা কাহিনী রচনা করে বলছি সবার কাছে। এ-মনোভাব মাস দুয়েক পর্যন্ত টিকে ছিল। এর পর এমন এমন অবস্থায় পড়ছিলুম যে, মেয়েটির কথা চেপে রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠছিল না আমার পক্ষে। বলতে বাধ্য হলুম শেষ অবধি। বললুম সময়-মন বুঝে এক একজনের কাছে। শুনলেন মা-বাবা। শুনল ভাইবোন, জ্ঞাতিস্বজন, বন্ধুবান্ধব। কেউ আর বাকি রইল না আমার গোপন কথা শুনতে।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। আমারও সেই দশা হল। চাপা জিনিস বাইরে বেরিয়ে পড়বার পর যে এতখানি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ব আমি একটুও বুঝতে পারিনি আগে। কোনো কূলকিনারা পাব বলে ধরেছিলুম এক একজনকে—সব আশা ব্যর্থ হল আমার নানা মুনির নানা মতে।

মেয়েটির চিন্তা ছাড়াবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল হিতাকাঙ্ক্ষী হিতাকাঙ্ক্ষিনীরা। ডাক্তার, বৈদ্য, সাধুসন্ত মায় মনস্তত্ত্ববিদদের দিয়েও আমার চিন্তারোগ সারাবার কসুর করতে ছাড়লেন না কেউ। রোগ সারাতে গিয়ে আরো রুগী হয়ে পড়লুম আমি। অর্থাৎ মেয়েটির চিন্তা নিবিড়ভাবে পেয়ে বসল আমায়।

প্রথম আচমকাই আমার সামনে এসে হাজির হয়েছিল মেয়েটি। অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যিখানে তার অপরিচিত মুখখানাই আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। কাকে মনে রাখবার জন্যই হয়তো সে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেছিল কিছুক্ষণ আমার দিকে। পরে ভিড় ঠেলে,

একেবারে সামনাসামনি এসে উপস্থিত হয়েছিল। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল ওর পাতলা ঠোঁটের কোণে। ওর টানা টানা দুচোখই বেশী হাসছিল।

ঐ চোখ দুটিই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল খানিক দূর অবধি। একটু থেমে তাকাল পিছনের দিকে মেয়েটি। ওকে অনুসরণ করে চোখ ফেরালুম আমিও। যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলুম, সে-জায়গা থেকে ছুটোছুটি করে পালাচ্ছে সকলে। একটা ভীতি-আর্তনাদ সকলেরই কণ্ঠে। পালাও! আগুন, আগুন!

আগুনের লেলিহান শিখা এগিয়ে আসতে লাগল ক্রমে আমাদেরই দিকে। কোনো ইতস্ততঃ না করেই, দ্রুতপায়ে কাছে এসে খপ করে আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরল মেয়েটি। অবাক হয়ে গেলুম আমি মেয়েটির দুঃসাহস দেখে। আমাদের কচ্ছিগুর্জর সমাজের কোনো মেয়েকে এর আগে এরকম করে সকলের সামনে একেবারে একটা অচেনা যুবকের হাত চেপে ধরতে দেখিনি। এরকম ব্যাপার কারো মুখেও শুনিনি।

আমার খুব লজ্জা লাগল। অথচ মেয়েটিকে মুখ ফুটে বলতেও পারলুম না কোনো কথা। দেখলুম, লাজ-লজ্জার বালাই নেই মেয়েটির। কে দেখছে না দেখছে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই তার। আমাকে একরকম টেনে-হিঁচড়েই নিয়ে চলল সে। বড় রাস্তায় এসে ছেড়ে দিল আমায়। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল নিজে।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আমার মনের মধ্যেই ঢুকে, জেঁকে বসল যেন মেয়েটি সেদিন থেকে। আমি তাকে ভুলতে গিয়েও ভুলতে পারি নি। ছাড়তে গিয়েও ছাড়তে পারিনি। ছাড়তে পারিনি একটা বিশেষ দিনে প্রথম দেখেছিলুম বলে হয়তো। কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদে আমাদের—গুজরাটীদের নতুন বছরের রাতে দেখেছিলুম তাকে প্রথম। পরদিন সকালেও তার হাসিমাখা মুখখানা মনে পড়ছিল আমার বার বার। মনে পড়ছিল আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর কথা।

হয়তো মেয়েটি আমার মন কেড়ে নিয়েছিল, নয়তো তার মন কেড়ে নিয়েছিলুম আমি। সেই জন্য এর পরেও হঠাৎ অনেকবারই দেখা হয়ে গেছে মেয়েটির সঙ্গে আমার। তাকে দেখার সঙ্গে যে আমার জীবনের সুখ-দুঃখের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকতে পারে—এটা গোড়ায় গোড়ায় বুঝি নি। বুঝলুম কিছু কিছু ঘটনা ঘটবার পর।

যখুনি তার হাসি মুখ দেখেছি, তখুনি আশ্চর্যজনকভাবে বাধা-বিপত্তি কেটে গেছে আমার। ব্যবসায় ডোবা টাকা উদ্ধার হয়েছে। অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছে। ঘরে-বাইরে চতুর্দিক থেকেই শুভ সংকেত পেয়েছি। এতে ওকে দেখবার প্রবল নেশা পেয়ে বসেছিল আমাকে। অনেক দিন না দেখতে পেলে বিষাদবেদনার ছায়া নেমে আসত মনের ওপর। ক্লান্ত হয়ে পড়ত মন। কর্মশক্তি হারিয়ে যেত আমার, চারপাশে যেন একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠত।

আমার হাসিকান্না জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে—তাকে যে আমি জীবনে কাছে পাব না কোনো দিন—বেশ বুঝতে পারছিলুম। যেভাবে যে অবস্থায় আসা যাওয়া করত সে-সেভাবে সে অবস্থায় কোনো মানুষই কোনো মানুষকে নিজের করে ধরে রাখতে পারে না।

সব জেনেশুনেও তার জন্য অস্থিরতা বাড়ছিল আমার দিন দিন। কেন এমন হয় বললুম সবার কাছে। কেউ শুনে হেসে উঠল বিয়ে পাগলা বলে—একটা বিয়ে-থা করলে ওসব চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এ জ্ঞান দিতেও ছাড়ল না। কেউ মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলল, মাথাটা একেবারে বিগড়োল! বেশীরভাগ চিকিৎসকই একমত হলেন একটি বিষয়ে—রুগী বড় কল্পনাবিলাসী।

সকলে একবাক্যে রুগীর ওষুধ বাতলিয়েছে—মেয়েটির চিন্তা ছাড়—ওকে ভুলে যাও। ওদের কথা রাখতে চেষ্টা করেছি আমি প্রাণপণে। সফল হইনি।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল দেখে, মা-বাবা পাত্রী দেখে বিয়ের স্থির করলেন। নতুন জীবন গড়ে তুলবে নতুন মেয়ে ঘরে এসে। বিয়ে

একটা জীবনের শুভ সূচনা। ভাল কিছু ঘটবার আগে হাসিমুখ দেখেছি মেয়েটির। এবারেও আশা করেছিলুম হাসিমুখে দেখব ওকে। ভেবেছিলুম ও নিশ্চয়ই আসবে আমার কাছে। কিন্তু এলো না।

বিয়ের দিন সকালে ঠাকুরমা মারা গেলেন হঠাৎ। বন্ধ হল বিয়ে। ঠাকুরমার জন্য মনটা আমার মুষড়ে পড়ল খুব। ওঁর প্রিয় বড় নাতির বিয়ে দেখার সাধটা মিটল না। কালাশৌচের পর বাগদত্তাকেই বিয়ে করবার কথা উঠেছিল আবার। আমিই নাকচ করে দিয়েছিলুম ও বিয়ে। একটা সাংঘাতিক বাধা পড়েছে যখন, তখন ও পাত্রীকে বিয়ে করব না কিছুতেই।

ছোটবেলা থেকেই একগুঁয়ে স্বভাব আমার। তাই আর পেড়াপীড়ি করলেন না বড়রা কেউ। বরং অন্য পাত্রী দেখেই বিয়ের দিন ঠিক করা হল আবার। এবারেও আশা করলুম, নিশ্চয় মেয়েটির হাসিমুখ দেখতে পাব বিয়ের আগের কোনো না কোনো দিনে। কিন্তু হতাশ হতে হল প্রথম বারেরই মতো। দেখতে পেলুম না মেয়েটিকে। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ভয় ধরলও খুব। প্রথমবারের অভিজ্ঞতাই সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল কেবল। আমার মনে হতে লাগল— এবারের কোনো না অমঙ্গল ঘটে বসে আবার। দুরু দুরু করে উঠল বুকের তলাটা।

এবারে অন্য কিছু ঘটল না। আমিই অসুস্থ হয়ে পড়লুম খুব। বিয়ের আগের দিন থেকে জ্বরে পড়লুম। একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল আমাকে নিয়ে। বিয়ে বন্ধ হল দ্বিতীয়-বার। সুস্থ হয়ে ওঠবার পর ভাবী কনেকে নাকচ করতে হয়নি এবারে আমায়। কনের বাবাই এরকম পাগল পাত্রের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে নারাজ হয়েছিলেন। পাত্রের জ্বর শুনে দেখতে এসে, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছলেন তিনি। যতক্ষণ শিয়রে বসেছিলেন, ততক্ষণ শুনেছিলেন, পাত্রের প্রেমিকা আহ্বান। তুমি এসো, তুমি এসো। কেন আসো না আমার কাছে আর···

পাত্রের জ্বরে ভগবান রক্ষে করেছেন তাঁর মেয়েকে। সর্বনেশে লোক পাত্রের বাড়ির সকলে। ঘুণাক্ষরে জানায়নি কেউ অপগুণের কথা। সম্পূর্ণ চেপে গেছল। এত সব জানতে পেরে, বুঝতে পেরে ওবাড়িতে নাক গলায় নাকি কেউ? মেয়েকে হাত-পা বেঁধে অগাধ জলে ফেলে দেয় নাকি কেউ?

এর পর ব্যবসার খাতিরে বাবার সঙ্গে বোম্বাই-এ গেলুম। ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে দু-চার দিন খুব ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল বাবাকে। প্রেসার বেড়ে গেল খুব বাবার। আমাদের বাসার কাছে নামকরা ডাক্তারই ছিলেন একজন। তাঁর চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন বাবা। চিকিৎসাসূত্রে ডাক্তারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল বাবার। ডাক্তার পছন্দ করতেন আমাকে খুব। ডাক্তারের পছন্দেই তৃতীয়বার বিয়ের দিন ধার্য করা হল আমার। আবার বিয়ের দিন! আমি যেন কেমন হয়ে গেলুম। রীতি-মতো একটা কিছু না ঘটলে—আমার বিয়ে দেবার ঝোঁক যাবে না বাবার। দু দুবার দেখেও শিক্ষা হল না। নাইবা হল আমার বিয়ে। আরো তো রয়েছে দুটো। ওদের একজনের দিলেই তো বংশ রক্ষে করবার দায় সারতে পারবেন উনি।

এ কথা জানিয়েছিলুম বাবাকে। বলেছিলেন বাবা, ওদের জন্য ভাবি নে। কবে বলতে কবে কি হয় আমার—তোরটা দেখে যেতে পারলে অন্ততঃ অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি।

এর ওপর আর কোনো কথা চলে না। নির্বাকমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছলুম আমি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এবারে আর মেয়েটিকে দেখবার চিন্তা করব না একবারের জন্যও। দু'দুবার ওকে দেখবার চিন্তা করেই অনর্থ ঘটেছে স্রেফ। আর তা ছাড়া আমি এখন দেশের বাইরে। যতবার দেখেছি মেয়েটিকে - দেশে থাকতেই দেখেছি। এখানে দেখবার চিন্তা করাটাও বৃথা।

বাবা বোম্বাই-এ বিয়ের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে মনস্থ করলেন। দেশে বিয়ে হওয়া মুশকিল হতে পারে। দু'বার ভেঙে গেছে।

পাত্রের বদনামও ছড়িয়েছে। বিয়ের জন্য বাড়ির সকলকে বোম্বাই-এ আনিয়ে নিলেন বাবা।

বিয়ের আগের রাতে আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, আমার সৌভাগ্যদেবী মেয়েটিকে। মেয়েটি হাসছে। খুব হাসছে। হাসতে হাসতেই এলো সে। আবার হাসতে হাসতেই চলে গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখলুম ওকে। আনন্দের ঢেউ খেলে গেল আমার ভিতরে। এ বিয়ে ভাঙবে না আমার। অমঙ্গল হবে না কোনো। পূর্ণ হবে বাবার মনস্কামনা।

বিয়ের লগ্নে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল আমার জীবনে। চিন্তা-কল্পনা-স্বপ্ন এ সমস্তর বাইরে এ ঘটনা। কনের বাড়ির আঙিনায় মণ্ডপমূরতের ভিতর বসে আছি আমি। গোধূলিবেলার আকাশের রঙ মণ্ডপমূরতের লাল সিল্কের সামিয়ানায় ঝরে পড়ছে যেন। আমের পল্লবঘেরা চার কোণায় চারটি বাঁশের পাশে পাশে সাতটি করে তামার ঘড়া। একটার ওপর একটা—পর পর চড়ে বসে আছে। তামার ঘড়াগুলোকেও লালচে দেখাচ্ছে। সবুজ ভেলভেটের আসন বিছানো পিঁড়ির ওপর বসে বসে এসব দেখছি আমি। এর আগে অন্যের বিয়েতে মণ্ডপ দেখেছি, তবুও দেখা জিনিসই নতুন নতুন ঠেকতে লাগল আমার চোখে। আমার সামনের চাঁপারঙের ভেলভেটের আসন বিছানো পিঁড়িটা তখনো খালি পড়ে রয়েছে! ওটা কনের। উপস্থিত বন্ধুদের ভিতর একজন অন্তরঙ্গ প্রথম থেকেই আমার পিছনে বসেছিল কনের মালা পরাবার পর, আমার হাত ধরে কনের গলায় নতুন মালা পরিয়ে দেওয়াবে বলে। হাতের রিস্টওয়াচটা দেখে নিয়ে, কানের কাছে মুখ এনে, ফিসফিসিয়ে বলল বন্ধুবর—ঠিক হয়ে বস! কনে আসবার লগ্ন হয়ে এলো।

পুরোহিত সবাইকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগলেন—লাডোলাড়ি সাওধান, কন্যা পধরাও সাওধান! হুঁশিয়ার করে দিলেন পুরোহিত বরকনেকে। হুঁশিয়ার করে দিলেন সমবেত সকলকে। কন্যা আসছে এ কথাও জানিয়ে দিলেন। মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের

বিয়ের গীত ভেসে আসতে লাগল কানে।

কনের সই ধরে ধরে মণ্ডপের ভিতর নিয়ে এলো কনেকে। কনের পরনে গোলাপী সিল্কের শাড়ি। মাথায় গোলাপী ওড়না ঢাকা। আমার সামনে দাঁড় করাল কনেকে সই। কনের বাহু দুটো ধরে ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়ানো হল আমার গলায়। এতক্ষণ লজ্জায় মুখ নীচু করেছিলুম। হাতে মালা দিয়ে মুখখানা তুলে ধরল আমার বন্ধুবর।

দেখলুম কনেকে। একি দেখলুম আমি! আমার চোখ মন বিবেক —সব অবিশ্বাসী হয়ে উঠল যেন কিছুক্ষণের জন্য। প্রকৃত বিয়ে হচ্ছে —বিয়ের মণ্ডপে বসে আছি ভুলে গেলুম। আমি দেখছি শুধু আমার সৌভাগ্যদেবী মেয়েটিকে। দেখছি ওর হাসি মাখানো চোখ-মুখ। এতদিন যাকে স্বপ্নে—ঘুমের ঘোরে দেখেছি—সেই স্বপ্নময়ীকে স্বপ্নের রাজ্যেই দেখতে লাগলুম যেন। সম্বিৎ ফিরে পেলুম বন্ধুবরের জোরে হাত দুটো টিপে ধরায়। আমাকে দিয়ে মালা পরিয়ে দেওয়ানো হল আমার স্বপ্নদেবীর গলায়।

বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে চলে এসেছি দেশে—এই ভুজ শহরে। দেশে ফিরে জানিয়েছিলুম স্ত্রীকে -- তাকে আগে থেকেই চিনি আমি। স্বপ্নকাহিনী আর বিয়ে ভাঙার কথাও শুনিয়েছিলুম। সব শুনে হেসেছিল স্ত্রী। সেও আগে থেকে আমায় চেনে বলে অবাক করে দিয়েছিল খুব।' এম-এতে ফার্স্ট হওয়ায় কাগজে ছবি বেরিয়েছিল আমার। সেই ছবিও অদ্ভুতভাবে পেয়ে গেছল স্ত্রী।

নতুন বছরের রাত্রে বাজী পোড়ানো হচ্ছে। তুবড়ি জ্বালাবার জন্য মোমবাতিতে একটা ঠোঙার কাগজ পাকিয়ে ধরিয়েছে সবে ছোট ভাই। বাজী পোড়ানো দেখবার কেমন একটা ইচ্ছে পেয়ে বসল হঠাৎ স্ত্রীর। আধ-ঘুমন্ত অবস্থাতেই ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ওর। ধড়মড় করে উঠে পড়েছিল বিছানা থেকে। ঘরের সামনের খোলা ছাদে এসে হাজির হয়েছিল। পাকানো ঠোঙার কাগজটা জ্বলছে তখন। ছবির দিকটায় এগিয়ে আসছে। কেন জানে না কাগজটা টেনে নিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। ছবিটা

দেখে মনে হল - কত জানাশোনা লোকটি। কত আপনার। ছবিটা নিজের স্যুটকেসে পুরে রেখে দিয়ে, জোড়হাত করে মনে মনে প্রার্থনা করেছিল—হে সূর্যদেব! এঁকে রক্ষে কর তুমি।

এর পর মাঝে মাঝে ছবিটা যেন টানত তাকে। সবার চোখের আড়ালে গভীর রাতে উঠে, স্যুটকেস খুলে বার করে, অপলক চোখে দেখত ছবিটা। মনে মনে বলত এঁর মঙ্গল হোক। ছবিটাকে ভালো লাগত খুব। এ কথা কারো কাছে বলতে ভরসা হয়নি ওর। কুমারী মেয়ের ভালো লাগাটায় অন্য অর্থ না ধরে নেয় কেউ। ছবির মানুষের সঙ্গে গোপন অভিসার চলে হয়তো কুমারীর। ছবিটা দেখিয়েছিল আমায় স্ত্রী। ওরও দু দুবার বিয়ে ভেঙে গেছে অসুখের জন্য। একবার বিয়ের আগের দিন পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যাওয়ার দরুন। আর একবার তিলক—পাকা দেখা হয়ে যাবার পর থেকে টাইফয়েডে শয্যাগত হয়ে পড়েছিল বলে। আমার সঙ্গে বিয়ে হবার পূর্বে পাত্রের এম-এতে ফার্স্ট হবার কথা শুনে ছবির তলার নামটার সঙ্গে বাবার বলা নামটা মিলিয়েছে বার বার নিভৃতে। নিজেকে নিঃসংশয় করে নিয়েছে। বাবা-মার আলোচনার মানুষটি তার ছবি কিনা সত্যিই ছবি মনে হতেই অব্যক্ত আনন্দে দু' চোখের জল ঝরেছে শুধু। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে—কোনো বাধাবিপত্তি যেন না আসে আর এ বিয়েতে।

শান্তিলালের কাহিনী শুনতে শুনতে এক অজানালোকে চলে গেছলুম। অজানা লোক থাকে ডাঃ শেঠের চেম্বারে ফিরে এলুম আবার শান্তিলালের কথাতেই।—ডাঃ শেঠের একমাত্র মেয়ে রতনবাঈ। পুত্রসন্তান নেই ওঁর। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দেশে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন উনি বিয়ে দেবার কিছুদিন পরেই। মেয়ের কাছাকাছি থাকবেন! তবুও তো মাঝে মাঝে চোখের দেখা দেখতে পাবেন মেয়েকে।

আজ ওদের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী। বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তাই দুজনে।

**ডাক্তার শেঠের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, উনি মৃত্থ মৃত্থ হাসছেন। মেয়ে-জমাই-এর অদ্ভুত জীবন কাহিনী শোনাবার জন্মই প্রথমে** চোখের ভাষায় বারণ করে দিয়েছিলেন ডাঃ শেঠ তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ করতে।

রতনবাঈ-শান্তিলালকে দেখলুম। দেখার আশা মিটছিল না আমার। আমি দেখছিলুম, একবার, তুবার—বার বার। তবু তুজনের তু' জোড়া চোখ যেন এক জোড়া মনে হচ্ছিল। তু' জোড়া চোখের একই গড়ন, একই চাউনি, একই হাসি।

কৈলাস মহারাজ বলছিলেন। আমি শুনছিলাম।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নাথ সিং। যতক্ষণ ঘরে ছিল, ততক্ষণ একই কথা শুনেছে বার বার। অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করেছে, পারেনি। পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে এরকম কথা শোনেনি কোনো দিন। কেউ বলেনি কখনো।

চারপাই-এর ওপর সর্বশরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়েছিল নাথ সিং। নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এখানে কেউ কোনো হদিস পাবে না তার সহজে। এককালের দেউড়ী নগরী এখন পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। কতদিন কেটে গেছে-তবুও জায়গাটার সম্বন্ধে ভীতি কাটেনি মানুষের মন থেকে একটুও। চারদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। দিনের বেলাতেই গা ছমছম করে ওঠে অনেকের। দুর্দান্ত ডাকাতরা যেন বসে আছে ঝোপ ঝাড়ের পিছনে পিছনে।

সাজানো নগরী হতশ্রী হয়ে পড়েছিল ডাকাতদের নির্মম নির্যাতনে। বহুদিন আগের কথা—দল বেঁধে বেঁধে ডাকাতরা আসত এখানে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিত নগরবাসীদের। এক একজনের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে, খুশীমনে ফিরে যেত যে যার গ্রামের ডেরায়। এইভাবে প্রায় লক্ষ লোকের বাসিন্দাদের ঘর ছাড়া— জন্মভিটে ছাড়া করেছে ডাকাতরা। পৈশাচিক উল্লাসের তাগিদে নিঃশেষ করেছে তিরিশ-পঁয়তিরিশ হাজার লোককে দুনিয়া থেকে।

হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করা গা শিউরে ওঠা এসব খবর মধ্যপ্রদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল এক সময়। ছড়ানো আছে এখনো। ছড়ানো খবর কানে এসে পৌঁছেছিল নাথ সিং-এর। নাথ সিং তখন ভাবছিল, কোথায় আত্মগোপন করবে। তাকে ধরবার জন্য সরকারী বেসরকারী লোকেরা চতুর্দিকে খোঁজা-খুঁজি করে বেড়াচ্ছে। ধরা

পড়লে তার প্রাণমান কিছুই যে বাঁচবে না—ভালো রকম জানে নাথ সিং।

শত্রুদেহের শত্রুমনের নাথ সিং-এর চোখের সামনে ভাসতে লাগল দেউড়ীনগরী। এইটাই সবচেয়ে অত্মাগোপনের নিরাপদ স্থান। কারো কোনো নজর নেই জায়গাটার ওপর। আগেকার ভীতির ভূত ঘাড়ে চেপে বসে আছে মানুষের এখনো। দেউড়ীর ধারে কাছে যেতে চায় না কেউ। পাছে আগেকার মানুষদের দুর্ভাগ্যের উত্তপ্ত নিশ্বাস বাতাস থেকে নেমে এসে পথিকের সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে যায়।

অল্প বয়স থেকেই ডাকাতিতে কুশলী হয়ে উঠেছিল নাথ সিং। পঁচিশ বছর বয়সেই ডাকাত সর্দার উপাধি পেয়ে গেছল সে। উপাধি পাবার পরই চলে আসতে হয়েছিল নাথ সিংকে দেউড়ীতে। ভালো লেগেছিল দেউড়ী। পুবদিকের পঞ্চবটীতলার কাছের ভাঙা ঘরটায় আস্তানা গেড়েছিল। পঞ্চবটীতলার পোড়ো শিবমন্দিরটা দেখে আত্মরক্ষার আবরণ খুঁজে পেয়েছিল।

দিনের আলোয় শিব পূজারী সন্ন্যাসী হবে নাথ সিং। রাতের অন্ধকারে নৃশংস হয়ে উঠবে আবার।

রাতের অন্ধকারেই পুবদিকের ঘরটায় প্রবেশ করল নাথ সিং। মাথার মণি সর্দারের জন্য আগে থেকেই চারপাই পেতে রেখে দিয়েছিল অনুগামীরা। শুয়ে পড়ল নাথ সিং। শুয়ে আছে। তন্দ্রা নামছে দু'চোখ ভরে। হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন বলছে—ওয়াপশ আজাও! উও রাহ্ ঠিক নহী।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নাথ সিং। তবুও শুনছে। চারপাই থেকে নামল সন্তর্পণে। ঘরের এদিক থেকে ওদিক অবধি পায়চারি করতে লাগল ঘন ঘন। একবার দু'বার—বারবার শুনছে একই কথা। ফিরে এসো! ও পথ ঠিক নয়। ঘরে কেউ নেই। কথা শুনছে তবুও। ঘর থেকে বেড়িয়ে এলো।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল যত দূর চোখ যায়।

কাছাকাছি জনপ্রাণী নেই। সম্পূর্ণ একা সে। জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে মাটির বুকে। পুবের বাতাস বেলফুল-বনফুলের গন্ধে মিশে ঘোরাফেরা করছে। বুক ভরে নিশ্বাস টেনে নিচ্ছে নাথ সিং। একটা অজ্ঞাত আনন্দের ঢেউ পা থেকে মাথা অবধি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন। কেবলই মনে হচ্ছে, ঘরে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

নাথ সিং-এর একটা মন টানছে ঘরের দিকে। একটা বাইরের দিকে। কে কথা কইল! কার কণ্ঠস্বর। এগিয়ে গেল খানিক। কেউ কোথাও নেই। আরো এগুলো।

অনুগত অনুগামীদের দেখতে পেল। শুয়ে আছে, জেগে কেউ—কেউ গভীর ঘুমে অচেতন। কেউ এমোড় থেকে ওমোড় পর্যন্ত যাতায়াত করছে। পাহারা দিচ্ছে।

আশ্চর্য হয়ে গেল নাথ সিং। ঘরের কথা বাইরে একবারও কানে এসে বাজল না। শোনবার ইচ্ছে করেও শুনতে পেল না। ফিরে চলল ঘরে। আগের মতো শুয়ে পড়ল চারপাই-এ আবার। আবার শুনতে পেল অবাক-করা কথা। ফিরে এসো! ওপথ ঠিক নয়। শুনছে মন দিয়ে নাথ সিং' হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে স্পন্দনে কথার এক একটি শব্দ নেচে উঠছে যেন। নিশ্বাসে নিশ্বাসে শব্দগুলো ধাক্কা মারছে মনের কানে অনবরত। এ এক নতুন অনুভূতিতে নতুন জীবনের স্বাদ পাচ্ছে যেন নাথ সিং। ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রতিরাতে এই কথা শোনা নাটকের অভিনয় চলতে লাগল পুবের ঘরের চারপাই-এ। প্রথম প্রথম নাথ সিং ভেবেছিল, নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে ঘটে সব অবাস্তব ব্যাপার। মনে হয় বাস্তব সত্যি। কিন্তু ভিতর ভিতর আগোচরেই যে একটা মস্ত পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছিল কথা শোনার সূত্র ধরেই, বুঝতে পারে'নি একদম। বুঝেছিল কিছুদিন পর। একটি ডাকাতি করার সময়।

নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ব্যতিক্রম ঘটেছিল। বাড়ি পোড়াবার আদেশ দিতে গিয়ে জিভে আটকে গেছল। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয়নি। আট বছরের রুখে দাঁড়ানো ছেলের সামনে থেকে

মায়ের গয়না তো দূরের কথা—একটা কানাকড়িও নিতে হাত ওঠে নি। নিজের কাছে নিজেকে খুব আশ্চর্য ঠেকেছিল নাথ সিং-এর সেদিন। সহকর্মীদের ফিরে যেতে বলেছিল। মুখ ফসকেই এ নির্দেশটা বেরিয়ে গেছল আচমকা। কর্মীরা হতভম্ব হয়ে নাথ সিং-এর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়েছিল খানিক। তারপর দ্বিতীয় কোনো আদেশ না পেয়ে প্রথম আদেশটাই শিরোধার্য করে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল সকলে।

পথে কারো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা কয়নি নাথ সিং। ঘর অবধি মৌন হয়েই ছিল একেবারে।

যতক্ষণ পথ চলেছে নাথ সিং, ততক্ষণ চোখের ভিতর অসহ্য জ্বালা-জ্বালা করেছে। তু'চোখ উপচে জল পড় পড় হয়েছে। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেছে। ডাকাতি জীবনে এমন তুর্বলতা এর আগে কখনো আসে নি নাথ সিং-এর।

ঘরে এসে পুরনো কথাই শুনেছে আবার। ভালো লেগেছে। খুব ভালো লেগেছে। কেবলই মনে হয়েছে - ওপথ থেকে ফিরে আসা উচিত। উচিত, উচিত।

এর পর থেকে বেশীর ভাগ সময়ই আনমনা হয়ে থাকত নাথ সিং। নাথ সিংকে ডাকাতি পেশায় নামাবার বৃথা চেষ্টা করে সঙ্গীরা এক এক করে সরে পড়ল শেষে।

পুবদিকের ভাঙা ঘরটাই প্রধান সম্বল হয়ে দাঁড়াল নাথ সিং-এর। ঘর থেকে একেবারেই বেরুবার ইচ্ছে হত না। ঘরে শুয়ে শুয়ে বুকে হাত রেখে দিনরাত নিশ্বাস গুনত আর 'ফিরে এসো…' কথাটা শুনত।

কথা শোনার শেষ হল একদিন। সেদিন শিবরাত্রি। ভোরের আলো এসে চোখেমুখে পড়েছে নাথ সিং-এর। উঠি উঠি করেও ওঠা হয়নি তখনো। মনে হল পায়ে যেন কার স্পর্শ পাচ্ছে। উঠে বসে দেখে, একটি বৃদ্ধ চারপাই-এ মাথা ঠেকিয়ে রয়েছে। লোল চামড়ার শীর্ণ তু'হাত তার পায়ে ঠেকানো।

পা দুটো সরিয়ে নিল নাথ সিং। মাথা তুলল বৃদ্ধ। জলভরা চোখে তাকাল নাথ সিং-এর দিকে। বলল, দর্শন দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইছ কেন প্রভু? দু'পা জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধ। ভোলানাথ ফাঁকি দিয়ে পালাতে দেবো না তোমায় আর।

ভোলানাথ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল নাথ সিং। কিছুক্ষণ। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলে উঠলো মন।

দলের কেউ কিংবা শত্রুপক্ষের কেউ হয়ত সরকারী মহলে খবর দিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধ ছদ্মবেশী গোয়েন্দা নিশ্চয়। মনস্থির করে ফেলল নাথ সিং মুহূর্তে। পালাবে না। ধরা দেবে। নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য, অন্তর্দাহ জুড়বার জন্য, অনেক পথ খুঁজেছে। পায়নি। সুযোগ এসে গেছে সামনে।

জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল নাথ সিং। - ভোলানাথ নই আমি। আমি নাথ সিং। ডাকাত! আমাকে আপনাদের সেপাই দিয়ে বন্দী করে ফেলুন। অনেক পুরস্কারও পাবেন।

নিমেষনিহত দৃষ্টি বৃদ্ধের। নাথ সিং-এর চোখে ওর চোখ দুটো আটকে পড়েছে। অস্ফুটে বলল, এ মুখ এ চোখ এ ভুরু—হুবহু পটে আঁকা শিবের ছবির মতো!

হেসে জানাল, তাকে যা তা বুঝিয়ে, ছলনা করে রেহাই পাবেন না পশুপতি। এ ঘরে যিনি থাকতেন তিনি সাক্ষাৎ দেবী। দেবী মোতিমালা। তাঁকে দেখেছি। কথা কয়েছি। তাঁর ঘরে দেবতারই আবির্ভাব ঘটবে এ তো জানা কথা। এ ঘরে দুর্জন লোকের স্থান নেই।

দুর্জন লোকের স্থান নেই? চমকে উঠল নাথ সিং। ঘরের আগেকার অধিবাসিনীর কথা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। বৃদ্ধকে দেখে মনে হচ্ছে দেহাতের সহজ-সরল মানুষ। ছদ্মবেশী গোয়েন্দার ধারণাটা একেবারে ভুল! বৃদ্ধকে বলল নাথ সিং, দেবীর কথা একটু বলুন না!

ফোকলা মুখে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সব জেনে শুনেও

অন্তর্যামী আমার মুখ দিয়ে যখন শুনতে চাইছেন—আদেশ পালন করব আমি।

জানতে আর বাকি রইল না নাথ সিং-এর—বৃদ্ধের মনের চোখে সাক্ষাৎ মহেশ্বরের মূর্তিতে খোদাই হয়ে গেছে সে। এ ভুল ধারণা শত চেষ্টা করে ভাঙতে গেলেও আর ভাঙবে না।

বলতে বলতে চুপ করে গেলেন কৈলাস মহারাজ। কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতে লাগলেন। নাথ সিং মোতিমালা কাহিনী মাঝপথে বন্ধ হওয়ায় শোনার আগ্রহ আমার দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। শোনার প্রত্যাশা নিয়ে ক্ষণ গুনছি আর কৈলাস মহারাজের কথা ভাবছি। এখানে এসে আকস্মিকভাবেই যোগাযোগটা হয়ে গেছল আমার কৈলাস মহারাজের সঙ্গে। শান্তসুন্দর দীর্ঘদেহী সুঠাম অঙ্গের কৈলাস মহারাজ প্রতিবৎসর শিবরাত্রিতে আসেন। আজও এসেছিলেন। প্রথম আলাপেই আমাকে আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। নাথ সিং-মোতিমালার কথা শোনাচ্ছিলেন এতক্ষণ ধরে।

ধৈর্য ধরে চুপচাপ বসে থাকতে পারলুম না আর বেশীক্ষণ। অভদ্রের মতো বলে ফেললুম, তারপর?

সম্বিত ফিরে পেলেন যেন কৈলাস মহারাজ। পূর্বকাহিনীর জের টানতে শুরু করলেন আবার।

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছে নাথ সিং। বৃদ্ধের দৃষ্টি সরে যাচ্ছে দূরে—অনেক দূরে। বলছে বৃদ্ধ, মোতিমালা নেই বছর পাঁচেক, কিন্তু আসি আমি তাঁর ঘরে। তাঁর শিবমন্দিরে। বছরে একটা দিনই আসি। শিবরাত্রিতে শিবের মাথায় জল ঢালতে, বেলপাতার মালা গলায় পরিয়ে দিতে। বছরের অন্তত এই দিনটাই মোতিমালার শিবকে দেখবে না কেউ – এটা আমি বেঁচে থাকতে হতে দিতে পারি নে। তিনি থাকতে অত এসেছি—নেই বলে কেউ আসে না। এটা বড্ড প্রাণে লাগে আমার। মৃত্যুপথের যাত্রী হয়েও—অনেক দূর থেকে আসতে হয় আমায় তাই।

মোতিমালার জীবন অদ্ভুত ধরনের। সতের-আঠারো বছরের

সুন্দরী মেয়ে এলেন শ্বশুর ঘর করতে। সাগরের বীরকুমারের ঘরে। বিয়ের পর কিছুদিন অবধি বেশ সুখেই দিন কাটিয়েছিলেন মোতিমালা। লোকে বলত, মোতিমালার মতো এমন স্বামী-সোহাগিনী বুঝি তুনিয়ায় দ্বিতীয়টি আর নেই।

নামের সঙ্গে মিল রেখে দামী মোতির আংটি আঙুলে পরিয়ে দিতে দিতে বীরকুমার বলেছিলেন মোতিমালাকে—এটা যেন কখনো হারায় না। হারালে আমাকে হারাবে জানবে।

মোতিমালা বলেছিলেন, জীবন থাকতে হারাবে না কিছুতেই। মোতিমালা চিরসঙ্গী এই মোতিকে নিয়েই হারিয়ে যাবে তুনিয়া থেকে। হারিয়ে যাবে এয়োতির চিহ্ন বজায় রেখে।

মোতিমালা বলেছিলেন যা ঘটেও ছিল তাই সত্যি সত্যি। তবে বড় করুণভাবে ঘটেছিল।

বাপের বাড়িতে মায়ের কাছে শবরীশিক্ষা পেয়েছিলেন মোতি-মালা। ছোটবেলায় শুনিয়েছিলেন মা, শবরীর রামপ্রীতির তুলনা নেই। পাছে বিষাক্ত ফলে রামচন্দ্রের ক্ষতি হয়—সেই ভয়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করে প্রত্যেক ফল খেয়ে পরীক্ষা করে দেখে, তবে সেই ফল রামচন্দ্রের মুখে তুলে দিয়েছেন তিনি।

শবরীর উদাহরণ জীবনের আদর্শ করে নিয়েছিলেন মোতিমালা। স্বামীকে জ্ঞাতি শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, স্বামীর সমস্ত খাবার নিজে খেয়ে তবে খেতে দিতেন। এ হেন মোতিমালাকে স্বামীর ঘর ছেড়ে চিরদিনের জন্য দেউড়ী এসে উঠতে হয়েছিল।

ঘরে থাকতে চেয়েও থাকতে পারেননি। যখন জানতে পেরেছিলেন স্বামীর পূর্ব প্রণয়িনীর কথা, তখন আকাশ ভেঙে পড়েছিল তাঁর মাথায়। অনুনয় করে বীরকুমারকে বলেছিলেন, যা হবার হয়ে আছে—তা থাক। সুখী যদি হও—তাকে নিয়ে থাকো—আমার আপত্তির কোনো কারণ নেই। কিন্তু আর যেন নতুন করে কেউ না আসে—এইটাই আর্জি।

মোতিমালার আর্জি নাকচ হতে দেরী হয়নি বেশী দিন। বীরকুমার

প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখেননি। নর্তকীদের সঙ্গে মেলামেশা চরমে উঠল তাঁর। নেশার খেয়ালে বাড়িঘর ভুললেন। ভুললেন মোতি-মালাকে।

নটীদের রঙমহলে চিঠি পাঠালেন বীরকুমারকে মোতিমালা। বীরকুমার যদি তার এ অভ্যাস ত্যাগ না করে, বাড়ি ফিরে না আসে—তাহলে অন্দরমহল ছেড়ে মোতিমালা যেখানে খুশি চলে যাবে। মোতিমালা যে সংসারে—যে আদর্শে মানুষ—সেখানে স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করে স্ত্রীরা। দেবতার দানবরূপ দেখতে চায় না মোতিমালা। স্বামীর ওপর শ্রদ্ধা বজায় রাখবার জন্যই তাকে দূরে সরে যেতে হবেই। অন্য কোনো গত্যন্তর নেই আর।

মোতিমালা ভেবেছিলেন, তাঁর চলে যাওয়ার কথাটা বীরকুমারের প্রাণে লাগবে নিশ্চয়। ফিরে আসতে বাধ্য হবে। ওপথ ছাড়বে।

ভুল ভাঙল পত্রবাহক ফিরে আসতে। চিঠি পড়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন বীরকুমার। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন চিঠিটা। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, কোনো রাজপুত জানানার ওড়না ধরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য নয়। যেখানে মন যায়—চলে যেতে পারে মোতিমালা।

সব শুনে, পাতলা লাল ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠেছিল মোতিমালার। ছলছল করে উঠেছিল দুচোখ। ওড়না ঢেকে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি। অভিমান চাপতে চেষ্টা করেছিলেন। অপমানের জ্বালা ঢাকতে চেষ্টা করেছিলেন।

জনশূন্য দেউড়ীর জায়গাটায় এসে উঠেছিলেন মোতিমালা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে। আজকের ঐ ভাঙা ঘরখানা একসময় নাকি মোতিমালাদেরই পূর্বপুরুষদের ছিল। সমাজ থেকে ঐশ্বর্য থেকে লোকালয় থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন মোতিমালা, তাই এই জায়গাটাই বেছে নিয়েছিলেন বোধ হয়।

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল মোতিমালাকে অনেকে। শ্বশুরবাড়ির লোক, বাপের বাড়ির লোক। কোনো পক্ষেরই কেউ

মোতিমালার ধনুক ভাঙা পণ ভাঙতে পারেনি। মোতিমালা এক কথাই বলেছেন সকলকে। বীরকুমার ওপথ ছেড়ে বাড়ি না ফিরলে মোতিমালা ফিরবে না আর কোথাও।

যতদিন ঐ ঘরে ছিলেন মোতিমালা, ততদিন তপস্বিনীর মতোই জীবন যাপন করে গেছেন। এসেছিল যারা তাঁর কাছে তাদের সকলেরই মনের পরিবর্তন হয়েছিল। পরবাসী ছেলে ফিরে গেছল পুত্রকাতর মায়ের কাছে। স্ত্রী-ত্যাগী স্বামী ফিরে গেছল অভিমানিনী স্ত্রীর কাছে। স্নেহভাজন-প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই হয়ত বিচ্ছিন্ন মানুষের ভিতর মিলন ঘটাবার এত চেষ্টা ছিল তাঁর। মানুষকে অসৎ পথ থেকে সৎ পথে ফেরাবার প্রবল আগ্রহ তোলপাড় করত তাঁর ভিতর সর্বক্ষণ। যারাই আসত তাঁর কাছে—তারা সকলেই একথা স্বীকার করতো।

অপরকে ফেরাতে পারলেও মোতিমালা নিজের স্বামীকে ফেরাতে পারেন নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকের মুখেই শোনা গেছে, মোতি-মালার কাছে হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে অবাক হয়ে গেছে তারা। একলা ঘরে বীরকুমারের ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। আস্তে আস্তে বলছেন, ওয়াপশ আজাও! উও রাহ্ ঠিক নহী।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে উঠল যেন নাথ সিং। চারপাই থেকে ছিটকে পড়ার মতো নেমে পড়ল মুহূর্তে। একথা তার খুব জানা। খুব শোনা।

দূরের দৃষ্টি কাছে ফিরেছে বৃদ্ধের। বলায় ছেদ পড়েছে। একদৃষ্টে দেখছে নাথ সিংকে।

তপস্বিনীর পবিত্রঘর ছেড়ে দূরে—অনেক দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে নাথ সিং-এর।

দরজার দিকে এগুতে যাচ্ছে, বাধা দিল বৃদ্ধ। বসতে অনুরোধ করল। ভোলানাথের পালিয়ে গেলে চলবে না। বসতে বাধ্য হল নাথ সিং। অস্বস্তি বাড়ছে। তার মতো দুর্জনের আর এখানে থাকা সাজে না।

বৃদ্ধের দৃষ্টি ফিরে গেল দূরে আবার। মোতিমালার জীবনের শেষ পর্বের কাহিনী বলা শুরু হল।

একবার শয্যাগত হয়ে পড়েছিলেন মোতিমালা। স্বামীর না ফেরার সংবাদ পেয়ে শরীর মন খুব ভেঙে গেছল। সামলাতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। অতিকষ্টে মনের জোর ফিরিয়ে এনেছেন সবে। সাবিত্রীর উদাহরণ খাড়া করেছেন সামনে। যমের মুখ থেকে যদি ফেরাতে পেরে থাকেন স্বামীকে সাবিত্রী—মোতিমালা পারবে না কেন বারবিলাসিনীদের কবল থেকে তার স্বামীকে উদ্ধার করতে। নিশ্চয় পারবে।

স্বামীর কাছ থেকে খবর এলো—মোতিমালাকে ফিরে যেতে হবে। ডেকেছেন বীরকুমার। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেছলেন প্রথমে মোতিমালা। তাঁর ইচ্ছাশক্তির জয় হয়েছে এতদিনে। স্বামী ঘরে ফিরেছে। তাঁকে ডেকেছে। তাঁকে বুঝেছে। কিন্তু একটু পরেই নিজের আত্মগর্ব খর্ব হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেল একেবারে। আগন্তুকের মুখে যা শুনলেন, তাতে ঘন বিষাদের ছায়ায় মুখখানা ছেয়ে গেল।

স্বামী গুরুতর অসুস্থ। নটীদের রঙমহলেই আছে। চতুর্দিক থেকে ঘিরে আছে তাকে নটীরা। যাবে না ওখানে যাবে না কিছুতেই। মরে গেলেও না। দৌড়ে ঘরে চলে গেছেন মোতিমালা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন।

এর পর থেকে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করেছেন মোতিমালা। আত্মঘাতীর পথ বেছে নিয়েছেন। ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলেছেন নিজেকে। মৃত্যুর পর যারা দেখেছিল মোতিমালাকে, তারা দেখেছিল মোতিমালার দেহে প্রাণ নেই বটে, কিন্তু স্বামীর উপহার দেওয়া আংটিটা আঙুলে জ্বল জ্বল করছে। মোতিমালার এয়োতির চিহ্ন।—সোহাগন ম্লান হয়নি একটুও। বীরকুমারের ছবিটা যেমন মাথার দিকের দেয়ালে ঝুলত, তেমনি দেয়ালে ঝুলছে। স্বামীর আগেই মোতিমালা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছলেন।

নাথ সিং আর বৃদ্ধের—দুজনেরই বুকভাঙা দীর্ঘ নিশ্বাস ঝরে পড়ল

এক সঙ্গে ঘরের ভিতর। নিশ্বাসেও শুনতে পেল নাথ সিং —'ওয়াপশ আজাও! উও রাহ্ ঠিক নহী'।

বৃদ্ধের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে নাথ সিং। পালিয়ে গেল দূরে, দূরে—বহু দূরে।

একটানা বলার পর চুপ করে রইলেন খানিক কৈলাস মহারাজ। মোতিমালার ঘরটার দিকে দু'চোখ মেলে ধরলেন। স্থির দৃষ্টি। চোখের কোণ চিক চিক করে উঠছে।

আমি দেখছি আর ভাবছি নাথ সিং মোতিমালার কথা। মোতিমালা পৃথিবীতে নেই। কিন্তু নাথ সিং কি আছে আজো? বার বার মনে প্রশ্ন জাগতে লাগল কেন জানি নে। কৈলাস মহারাজ তো জানিয়েই দিয়েছেন, নাথ সিং এ জায়গায় থাকতে পারেনি। পালিয়ে গেছল। তবুও বোকার মতো জিজ্ঞাসা করে বসলুম, নাথ সিং কোথায় আছে—আর কি ওর কোনো খবর পাওয়া যায়নি?

প্রশ্ন শুনে হাসলেন কৈলাস মহারাজ। গেরুয়া চাদরে কপাল-মুখ মুছে নিলেন বার দুয়েক। উঠে পড়লেন তাড়াতাড়ি। মৃদুস্বরে বললেন, নাথ সিং-এর আগের জন্মের মৃত্যু হয়েছে। নাথ সিংকে কোথাও খুঁজে পাবে না আর কেউ কখনো।

ষাট বছরের বৃদ্ধ কৈলাস মহারাজ পঁচিশ বছরের যুবকের মতো পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলেন পুবের ভাঙা ঘরটার দিকে। মোতিমালার ঘরের দিকে।

অবাক হয়ে দেখছি আমি। ঘরটা যেন ওঁকে টানছে ভয়ানক-ভাবে। প্রবাসী ছেলে ঘরে ফিরে এলে যেভাবে মা তাকে বুকে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই উনি একরকম ছুটেই ঘরে ঢুকে পড়লেন। সম্মোহিতের মতো দেখলুম আমি। উনি ঘরের মেঝেয় মাথা ঠেকালেন। ঠেকিয়েই রইলেন। পিছন ফিরে তাকালেন না আর একবারের জন্যও।

১৯৪২ সাল। বেনারসে যে বাড়িতে এসে উঠলুম সে বাড়িটি একটি ভদ্রলোকের তত্ত্বাবধানে থাকতো। ভদ্রলোকের নাম জীবেন গাঙ্গুলী। এখানে ব্যবসা। একলাই থাকেন। অবিবাহিত। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বেশ লম্বা-চওড়া দেখতে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড় অবধি। আমাব বন্ধু আর আমাকে দেখেই দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কথাবার্তায় ব্যবহারে বেশ প্রাণখোলা ভাব।

আমার বন্ধুর বাবার বন্ধুর বাড়ি এটা। বন্ধু এখানে থাকবে দিন সাতেক। তারপর ওদের সোনারপুরার বাড়িতে চলে যাবে।

এ বাড়িটি রামাপুরার শেষের দিকে বেশ ফাঁকা জায়গায়। দোতলা বাড়ি। কলকাতার ধরনের। নির্জন পরিবেশ ভালোই লাগছিলো। শহরে থেকেও যেন শহর থেকে দূরে। বাড়িটির উঠোনে একটি ডুমুর গাছে বানরের উৎপাত প্রায় রোজই দেখতুম। তাদের ছেলে বুকে করে করে দলে দলে আসা গাছ ভাঙা ইত্যাদি।

জীবেনবাবুর সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা জন্মালো। তিনি আমাকে ছাড়তে রাজী নন। বলেন. আপনার বন্ধু চলে গেলেও আপনি এখানে থাকুন। আমি বড় একলা। তবু কিছুদিন আপনার সঙ্গলাভে আমার নিঃসঙ্গতা ঘুচবে। আর পারছিনে মশাই। মিলিটারীতে ছিলুম। এই দেখুন ফোটো। এখন ব্যবসা নিয়ে থাকি। অনেক আঘাত পেয়েছি বড় ভাইয়ের কাছ থেকে। বড় ভাইকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতুম। কিন্তু সে যা প্রতিফল দিয়েছে. সেকথা মনে পড়লেও আমি অস্থির হয়ে উঠি। আমার সর্বস্ব নিয়ে আমাকে ভিখিরি করতে চেয়েছিলো। নিয়েছে সব, কিন্তু ভিখিরি করতে পারেনি।

বুঝলুম, ভদ্রলোক এমন আঘাত পেয়েছেন জ্ঞাতি স্বজনের কাছ থেকে যে আর কলকাতায় ফিরতে চান না। এখানে নির্জন অন্তরীণকেই শেষ জীবনের সমাপ্তি অবধি বেছে নিয়েছেন। আমি কথা দিলুম যে ক'দিন কাশীতে থাকি, এখানেই থাকবো। আর সত্যি কথা বলতে কি, এখানে তো কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

বন্ধু তাদের বাড়িতে চলে গেলো। আমি একলা থাকি। জীবেনবাবু সকাল আটটায় বেরিয়ে যান তাঁর গোধোলিয়ার দোকানে, ফেরেন সন্ধ্যা ছটা সাতটায়। একদিন দুপুরে দোকান থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে আমাকে জানালেন, তাঁর বড় ভাই মৃত্যুশয্যায়। বড় বৌদি টেলিগ্রাম করেছে। তাঁকে যেতে বলেছে শীগগির। কিন্তু তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আমার পরামর্শ চাইলেন। আমি তাঁকে অতীত ঘটনা ভুলে মৃত্যুর সময় ভাইয়ের সঙ্গে শেষ দেখা করতে পরামর্শ দিলুম।

ভাই মারা যাবার পর জীবেনবাবু ফিরে এলেন। যেন পূর্বের মানুষ নন। মানুষের মনের এতো পরিবর্তন হয়, এই প্রথম দেখলুম। তিনি আমায় বললেন—আপনাকে প্রথমে যা বলেছিলুম, সে কথা সত্যি নয়। ভাই আমার খুব ভালো ছিলো। আমিই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলুম। আজ আমার খুব অনুশোচনা হচ্ছে। মরবার সময় যে ভাবে দাদা আমার দিকে চেয়েছিলো, তাতে সে যে অতীত ঘটনা ভুলতে পেরেছে আমার মনে হল না। আমি ক্ষমা চাইতে গিয়েও নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য ভেবে পেছিয়ে গেলুম।

জীবেনবাবুকে খুব চিন্তিত দেখে সান্ত্বনা দিলুম।

গরমকালে বেনারসে প্রায় সকলেই রাত্রে ছাদে শোয়। আমি কিন্তু নীচেই থাকতুম। জীবেনবাবু ছাদে শুয়েছেন। আমি নীচের উঠোনে। রাত্রি বোধ হয় দুটো-আড়াইটে! কার ভয়ার্ত চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে বুঝতে পারলুম, জীবেনবাবুরই গলার আওয়াজ। আমাকে ডাকছেন, বলছেন —শীগগির আসুন, আমাকে বাঁচান।

আমি ভাবলুম, কি ব্যাপার! তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়ে দেখি, ভদ্রলোক ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছেন। চোখ বিস্ফারিত। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। গা-হাত-পা থর থর করে কাঁপছে। আর তাঁর পেছনে একজন দাঁড়িয়ে—প্রতিহিংসার আগুন যেন তার দুটো চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমি জীবেনবাবুর কাছে এগিয়ে যেতেই লোকটি সরে গেলো। আমি জীবেনবাবুকে জড়িয়ে ধরলুম। সাহস দিলুম। ধরে ধরে নামিয়ে নিয়ে এলুম। নীচে এসে জীবেনবাবুর মাথায় চোখে-মুখে জলের ছিটে দিলুম। তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ালুম।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে জীবেনবাবু তাঁর দাদার নাম করলেন। বললেন, দাদা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকছিলো। ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি, কি ভয়ানকভাবে দাদা চেয়ে দেখছে আমায়।

কৌতূহল চাপতে না পেরে ওঁর দাদার চেহারার কথা জিজ্ঞেস করায় উনি সুটকেস খুলে এবারে নিয়ে আসা-দাদার একখানি ফোটো বার করে দেখালেন। ফোটো দেখে আমি স্তম্ভিত—একি! ছাদে তো আমি এই রকম চেহারার লোককেই দাঁড়িয়ে থাকতে, সরে যেতে দেখেছি। তখন ভেবেছিলুম, বোধ হয় ঘুমের ঘোর, মনের ভুল, চোখের মোহ। কিন্তু তা নয়। এ চেহারার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে। ফোটোটিকে টেবিলের ওপর রেখে দিলুম। জীবেনবাবুকে শুতে বলে, ভয় নেই আশ্বাস দিয়ে, পাশের ঘরে এসে বিছানায় বসলুম। ভাবছি আজ আর ঘুম হবে না। এমনি একটু চুপ করে শুয়ে থাকা যাক। ভোর হতে তো অনেক বাকী। আচমকা একটা অঘটন ঘটে গেলো জীবেনবাবুকে নিয়ে। মনটা ভীত নয়, কিন্তু ভারাক্রান্ত যে হয়েছিলো, একথা স্বীকার করতেই হবে।

হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এলো। আমি অশুভ আশঙ্কা নিয়ে জীবেনবাবুর ঘরে গেলুম। গিয়ে দেখি, জীবেনবাবু খাট থেকে মেঝেয় পড়ে গোঁ-গোঁ করছেন তাঁর দাদার ছবির দিকে নিমেষ-নিহতদৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাঁর দাদার ছবির দিকে ভালো করে চেয়ে

দেখলুম—জীবন্ত বলে মনে হল! কি বীভৎস চাউনি! ছবি জীবন্ত হয়ে জীবেনবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে। আমি জীবেনবাবুকে ধরে তুলে, চেয়ে দেখি, কেউ নেই!

জীবেনবাবুকে আমার ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলুম। খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে জীবেনবাবু বললেন--দেখুন! আমি আর বাঁচবো না। বড়দা খালি আমায় ডাকছে। কোনদিন আতঙ্কে হার্টফেল হয়ে যাবো। আমাকে বাঁচাতে পারেন কোন প্রকারে, কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে?

আমি বোঝালুম-দেখুন, মানসিক উদ্বেগ, শোক-তাপ পূর্বের অনুশোচনা মিলিয়ে আপনার মন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই এ রকম ভয়ের ছবি দেখছেন। ওসব কিছু নয়।

নিজের মনকে বোঝাতে থাকি—স্নায়বিক দৌর্বল্য ব্যাধি কি আমারও হল! মনের কোণে এ রকম ঘটনা কখনো জন্ম নিতে সুযোগ পায়নি ছোটবেলা থেকে, কিন্তু কেন এমন অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে? আমারই বুঝিবা মাথার কিছু গোলমাল হতে শুরু করেছে।

সারা রাত জীবেনবাবুকে নিয়ে বোঝাবুঝির পালা চললো। একটা অস্থিরতা মনকে তোলপাড় করতে লাগলো।

স্থির করলুম, জীবেনবাবুকে আমার কাছেই কিছুদিন দিন-রাত রেখে দেবো। তাই করলুম। কিন্তু জীবেনবাবুর শরীর দিন দিন ভেঙে যেতে লাগলো। আমার সঙ্গে যেদিন শোন সেদিন কিছু হয় না। যেদিন আলাদা বিছানায় শোন, রাতে ভীষণ ভয় পান।

জীবেনবাবুর মাথা খারাপ হয়েছে ভেবে, আমি কলকাতায় তাঁর বাড়িতে খবর দিলুম। তাঁর বড় বৌদি, ভাইপো ও অন্য আত্মীয়েরা এসে জীবেনবাবুকে নিয়ে গেলেন।

বাড়ির মালিক জীবেনবাবুর বাল্যবন্ধু। জীবেনবাবুর এই সব অবস্থার কথা শুনে দেখতে আসায় আমার সঙ্গে আলাপ হল। আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকতে বিশেষ করে বলে গেলেন। এখান

থেকে যাবার আগে তাঁকে যেন জানিয়ে তবে যাই, এটা বার বার করে বলে দিলেন—বোধহয় বাড়ি খালি পড়ে থাকবে বলে।

জীবেনবাবু চলে যাওয়ায় মনটা বড় খারাপ হয়ে গেলো—এতোদিন একসঙ্গে ছিলুম। তাতে আবার তিনি অসুস্থ মন নিয়ে গেলেন!

জীবেনবাবুর বৌদি প্রায় মাসখানেক বাদে আমাকে একখানা চিঠি লেখেন—ঠাকুরপো আপনাকে দেখতে চাইছেন। মরণাপন্ন অবস্থা। আপনি দয়া করে একবার আসুন!

আমি বাড়ির মালিককে চিঠি লিখলুম, কলকাতায় জীবেনবাবুকে দেখতে যাচ্ছি। তিনি যেন বাড়িতে কাউকে রাখবার ব্যবস্থা করেন। চিঠিটা ডাকে ফেলতে বেরুবো, এমন সময় পোস্টম্যান এসে, বাড়ির মালিকের হাতের লেখা চিঠি আমাকে দিলে। পরেশবাবু লিখেছেন—আপনি জীবেনের দোকানের ম্যানেজারের ওপর বাড়ির ভার দিয়ে শিগ্র চলে আসুন আমার এখানে। জীবেন আপনাকে দেখতে চায়। সে আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছে। আমি আপনাকে সঙ্গে করে তাব কাছে নিয়ে যাবো।

চিঠিব পরেই চিঠি পেয়ে, আমার লেখা ছিঁড়ে ফেললুম। বাড়ির মালিকের কথা মতো ব্যবস্থা করে, কলকাতায় ফিরে এলুম।

তিনি যেন আমি আসাব পথ চেয়েই বসেছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—বাঁচালেন মশাই, আমি জীবেনকে আপনার সঙ্গে দেখা করাবার প্রতশ্রিুতি দিয়ে যে কি মুশকিলে পড়েছি, সে আর বলবার কথা নয়। চলুন! আপনাকে নিয়ে আগে তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজ। কখন যে কি হয় তার ঠিক নেই। যমে-মানুষে টামাটানি হচ্ছে। কিছুতেই কিছু হল না। কোন চিকিৎসাই ফলবতী হচ্ছে না।

জীবেনবাবুদের বাড়িতে এলুম। জীবেনবাবুকে চিনতেই পারা যায় না, অদ্ভুত চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেছে। সমস্ত অঙ্গে মৃত্যুর কালো-ছায়া ঢেকে দিচ্ছে। এটেনডেন্ট নার্সের কাছে জানতে পারলুম জীবেনবাবুর নিশ্বাস ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতম হয়ে আসছে।

পাল্‌সের অবস্থা অতিরিক্ত অস্বাভাবিক। জীবেনবাবু চেয়ে আছেন শূন্যে। দৃষ্টি যেন বাঁধনহারা কোন অদৃশ্য আকর্ষণে আটকে পড়েছে। অনেক বলা হল—আমি এসেছি। কোথায় সে কান, কে শুনবে, কাকেই বা বলা হচ্ছে! কোথায় সে চোখ, কে কাকে দেখবে! যাক, জীবেনবাবু আর কোন বীভৎস দৃশ্য দেখবেন না কখনো। তাঁর চির-শান্তি হোক।

জীবেনবাবুর মাথাব কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, আমার আসাটা তাঁর প্রাণ চলে যাবার মুহূর্তে স্পর্শ দিয়ে জানাতে। কিন্তু একি! জীবনবাবুর শিয়রে কে দাঁড়িয়ে! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? চোখে হাত দিয়ে ভালো করে মুছে নিলুম। না, স্বপ্ন নয়, এ যে স্পষ্ট সেই কাশীতে অঘটন ঘটার দিনের ছাদের মূর্তি, ঘরে জীবন্ত ছবির মূর্তি।

জীবেনবাবুর দিকে চেয়ে দেখি তাঁর চোখ বুজে গেলো, ঠোঁট কেঁপে উঠলো। সব নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ। জীবনবাবুকে জীবিত অবস্থায় স্পর্শ করা হল না আর।

অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ঘটনাই খালি আমায় ছুঁয়ে ছুঁযে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমি বাড়ির মালিককে পরে সব ঘটনা বলে-ছিলুম। তিনি আমায় বলেন, সে সময় তিনিও ওই মূর্তি দেখেছেন।

উনি জীবনের বড়দা। বড়দা জীবেন দু বছরেব ছোট-বড়। একটি মেয়েকে নিয়েই দুভাইয়ের ভরা যৌবনে যতো অশান্তি বিচ্ছেদ মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়েছিলো। সে ভাব প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমানায়ও শেষ হয়নি। সেই মেয়েটিকে বড়দা খুব ভালোবাসতো। সে বড়দাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। উভয়ের বিয়ের ঠিক-ঠাক। এমন সময় জীবেন মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। কোথায় যে গেলো তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি অনেকদিন। একদিন জীবেন নিজেই এসে জানিয়ে দিলে—মেয়েটি গঙ্গায় চান করতে গিয়ে ডুবে গেছে। বড়দা জীবেনের কথা বিশ্বাস করেননি।

বড়দা বলেছিলেন, সেই মেয়ে নাকি স্বপ্নে তাঁকে বলেছে, জীবেনের কথা সত্যি নয়।—বর্ষায় কাশীর গঙ্গা যখন প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধরে, তখন

একূল ওকূল খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখা যায় না। খালি জল আর জল। বিশাল জলরাশির দুর্বার গতিতে একটু কিছু পড়লে সে কোথায় তলিয়ে যাবে নিমেষের মধ্যে। ওই ভয়ঙ্কর সময়ে বর্ষায়, মেয়েটিকে জীবেন কাশীর গঙ্গা দেখাবার ছল করে নিয়ে যায়, অন্ধকার রাত্রে তাকে ঠেলে দেয়। মেয়েটি হারিয়ে যায়। একা নয়, ছমাসের শিশুকে গর্ভে নিয়ে।

আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে উঠল হঠাৎ। একটা অজ্ঞাত ত্রাস ছেয়ে গেল সকলের চোখেমুখে। একটু আগের হাসিখুশি মানুষরা কেমন যেন হয়ে গেল মুহূর্তে। মনে হচ্ছে, সকলেই কিছু একটা বলতে চাইছে। জানতে চাইছে। কিন্তু ওদের মুখে কথা সরছে না বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। পাহাড়ের চড়াই-এর দিকটায় সত্রাসে তাকাচ্ছে থেকে থেকে। একটি তন্বী তরুণী পাহাড়ের উঁচুনীচু পথ ধরে চলেছে উত্তরমুখো।

ভোরের বাতাস তরুণীর শুভ্র ওড়না দোলাচ্ছে বারবার। চলার ছন্দে সুঠাম অঙ্গের দোলনে গোলাপী ঘাগরা ছড়িয়ে পড়ছে, ফুলে উঠছে কখনো ডানদিকে কখনো বাঁদিকে। কোনো দিকে লক্ষ্য নেই তরুণীর। সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে শুধু। এগিয়ে চলেছে যেন হিমাঞ্চলের কোলে কোলে হেলেদুলে পাহাড়ী ঝর্ণা।

স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়ী ঝর্ণা আমার গন্তব্যস্থলের দিকেই চলেছে। গাইডের দিকে ফিরে তাকালুম। আমার মনোগত ইচ্ছে ও বুঝলো হয়তো। তরুণীটিকে অনুসরণ করে যেতে চাইছি। সবেগে মাথা নাড়াল। ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল—না, ওকে অনুসরণ করা চলবে না। গাইডের সঙ্গী চারজনও নির্বাক মুখেই গাইডের আকার-ইঙ্গিত অনুকরণ করল হুবহু।

আমি বিস্ময়বিমূঢ়। তাজ্জব পরিস্থিতি। ওদের মুখের ঘন ত্রাসের চাপ একটুও ফিকে হয়নি। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার ঘুরে এলো চতুর্দিকে নিমেষে। ত্রাসের কোনো কারণ নজরে পড়ল না। ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠলুম ওদের উপর খুব। প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া অপূর্বসুন্দর কুসুম-উদ্যান দেখা পণ্ড হয় বুঝি আমার। কত

দিনের কল্পনার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছিল। সত্যির পথে বাধা হয়ে এসে দাঁড়াল আমার গাইড।

সংশয়ের দানা বেঁধে উঠতে লাগল গাইডের ওপর। গাইডের সঙ্গীদের ওপর। নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি আছে ওদের মনে। ত্রাসের ভান করে ত্রাস সৃষ্টি করাটাই এদের প্রস্তুতিপর্ব। কোনো মক্কেলের ভয়বিহ্বল অবস্থাতেই এদের উদ্দেশ্য পূরণ হয় হয়তো। টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয় নিভৃতে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে।

মনে ভয় ধরলেও মুখে প্রকাশ করা ঠিক হবে না। ওদের সম্বন্ধে আমার ধারণা জানতে পারলে বিপদ ঘনিয়ে আসবে তাড়াতাড়ি। বিদেশ-বিভুঁয়ে মুশকিলে পড়ব শেষে। নিজের দুর্বলতা সংযত করে রাখবার চেষ্টা করলুম। সাহস দেখিয়ে মুখে বললুম, একলা জায়েঙ্গে। কিসিকো পরোয়া নহী করতে হেঁ। পা বাড়ালুম উত্তরমুখো।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল সকলে আমাকে। গাইড তার বজ্রমুষ্টিতে আমার ডানহাতের কব্জি চেপে ধরল। আমি হতবাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অনুনয়ের সুরে গাইডের অস্পষ্ট কথা শুনে, সন্দেহের অবসান হল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। সাহস ফিরে পেলুম! আমার মুখের ওপর করুণদৃষ্টি মেলে ধরে গাইড বার বার বলতে লাগল—কভী নহী জানে দুঙ্গা আপকো ইস বখত্। ডাইন্-মায়াবিন্ যাদ্করী জাতি হ্যায় অভী।

আরো অনেক কিছু বলতে লাগল গাইড।—ওর চোখের সামনে পড়লে নাকি আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওর চোখের আওতা থেকে কারো বেরুবার উপায় নেই। জ্যান্ত মানুষ খেতে দেখেছে ওরা। ওদেরই এক দোস্তকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল ডাইনী। পরে তাকে আরে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যখন পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল মানুষটা মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে খাদের ভিতর। ডাইনীর এত সব কীর্তিকলাপ জেনেশুনে প্রাণ থাকতে বাবু সাবকে অঘোরে প্রাণ হারাবার জন্য ছেড়ে দিতে পারে না কিছুতেই গাইড।

গাইডের ওপর, গাইডের লোকদের ওপর আমার ভুল ধারণার

জন্যে মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম। কুসংস্কার থাকতে পারে ওদের, কিন্তু ওরা দুর্বৃত্ত নয়। মক্কেলকে প্রভুর মতো বাঁচাবার কত না চেষ্টা ওদের।

মায়াবিনী-ডাইনী যাদুকরী সুন্দরী তরুণীটিকে দেখবার আগ্রহ বেড়ে উঠল গাইডের মুখ থেকে সব শোনবার পর। কাণ্ডোলিয়াসেইন-এর কুসুম উদ্যানে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লুম। একসঙ্গে ফুলবাগান আর ডাইনী—দুই-ই দেখতে পাব। মনের কথা মনেই রাখলুম। প্রকাশ হলে বিপত্তি বাড়বে বই কমবে না। গাইড একদম সঙ্গই ছাড়ছে না।

হেসে জানালুম ভয় নেই। যাব না আমি। ধর্মশালায় ফিরে যাব। ওদের ফিরে যেতে বললুম। বিশ্বাস করল ওরা আমার কথা। আমায় ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল সব।

একটা কালো পাথরের ওপর বসে রইলুম চুপচাপ। কিছুক্ষণ। দূরের নীল আকাশের কোলে নীল পাহাড় মিশেছে যেন। তন্ময়তা আসছিল। নিজেই যেন আকাশ-পাহাড়ে মিশে যাচ্ছিলুম। তন্ময়তার ঘোর কেটে গেল আচমকা।

বাবুসাব!

পিছন ফিরে তাকালুম সবিস্ময়ে। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে হাসছে। চোখেমুখে চাপা কৌতুক। অবাকদৃষ্টিতে দেখছি আমি বৃদ্ধাকে। এলো কোত্থেকে এ সময় এখানে।

বৃদ্ধা যেন মনের কথা শুনতে পেল। সুন্দর হিন্দীতে বলল, পাহাড়ের ওপরেই আমার পাথরের ডেরা। ওপর থেকে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি, সব শুনেছি। আমার মন বলছে, তুমি যাবে বলেই ওদের সরিয়ে দিয়ে বসে রইলে। নাইবা গেলে বাবুসাব—ডাইনী যখন গেছে ওখানে।

হিন্দীতেই বললুম, ডাইনী আমি বিশ্বাস করি নে। ওদের কোনো কথাই বিশ্বাস করিনি আমি।

হেসে উঠল বৃদ্ধা। প্রাণখোলা হাসি। কেন জানি নে—যাবার

সঙ্কল্পের কথা শুনে, ডাইনী অবিশ্বাস করি শুনে বৃদ্ধা এত খুশি হয়ে উঠল। মনে হল আমার ওপর সদয়ও হয়েছে। ইশারায় অনুসরণ করতে বলল। মুখে বলল, ওই দিকেই যাচ্ছি।

পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে পায়ে পায়ে এগুচ্ছি আমরা দুজনে। বৃদ্ধা আর আমি। বৃদ্ধা আগে, আমি পিছনে। খানিক চলার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বৃদ্ধা। সামনে খাদ। হুঁশিয়ার করে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে নির্দেশ দিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বৃদ্ধা। ভূর্জিপত্রগাছের পাতাগুলো কেঁপে উঠল বুঝি বৃদ্ধার নিশ্বাসে। খরস্রোতা ভুন্দর নদীর জলপ্রপাতের আওয়াজ উঠছে নীচে থেকে। বৃদ্ধা চলছে, চলছে আর চলছে!

বাবুসাব! পাশে খাদ দেখলে? ওই খাদেই মোহনলালকে পাওয়া গেছল। পাওয়া গেছল তার লাশটাকে। প্রাণ ফিরে পাওয়া যায়নি। জানি নে এখানকার বাতাসে—নদীর জলে—কি ঝর্ণার জলে তার প্রাণ খেলা ক'রে বেড়াত কিনা। কিন্তু যে ফুলের জন্য তাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিল, সে-ফুল আজো এই রাস্তা ধরেই যাওয়া-আসা করে।

বৃদ্ধার কথাগুলো অসংলগ্ন ঠেকছিল, প্রলাপ মনে হচ্ছিল। উদ্গত প্রশ্ন চাপতে গিয়েও মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়ল—কি ফুল যাওয়া-আসা করে এখান দিয়ে?

বিষণ্ণমধুর হাসির রেখা ফুটে উঠল বৃদ্ধার ঠোঁটের ফাঁকে। সব—সব ফুলের সেরা এ ফুল। একটি মেয়ের নাম। ফুলের মতোই মানুষের মনভোলানো রূপ তার। ফুলের মতোই নরম তার ভেতরটা। ঠাকুর্দা শখ করে আদুরে নাতনীর নাম রেখেছিল ফুল। সার্থক নামকরণ। কিন্তু ফুলের মধ্যেও বিষাক্ত কীট থাকে বাবুসাব। এ ফুলের মধ্যেও মানুষমারা বিষাক্ত কীট ছিল। ফুলের কালো ভ্রমর-চোখ দুটিই ছিল দুটি মারাত্মক কীট। যাদুকরী দু-চোখ ছিল মস্ত হাতিয়ার ফুলের।

এই দুটি হাতিয়ার দিয়েই অনেক দুরন্তযৌবনের দুর্দান্ত মানুষকে ঘায়েল করেছে ফুল। ঘায়েল করেছে সরযুকে, সরযুর দলকে।

ঘায়েল করেছে নাগমণিকে, নাগমণির দলকে। মানুষকে ঘায়েল করা আর খেলানো খুব প্রিয় ছিল ফুলের।

ভোর না হতেই জোয়ানের দল এসে ভিড় করত ওর চারপাশে রোজ। জোয়ানদের নিয়ে কতই না গলাগলি ঢলাঢলি করত ফুল। সকলেই ভাবত ফুল বুঝি তার একলারই—অন্য কারো নয়। ভুল ধারণার পরিণতি যা তাই ঘটল। নিজেদের ভেতর রেষারেষি হাতা-হাতি খুনোখুনি। খুন হল মোহনলাল। সকলেই জানে নাগমণির দলেরই কাজ এটা। কিন্তু ওদের এতই প্রতাপ যে, মুখ ফুটে কেউ একটা কথাও বলতে পারল না ওদের বিরুদ্ধে।

এই খাদের ধারে যখন এলো ফুল, তখন কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওকে দেখবার জন্য। খাদের ভিতর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখল মোহনলালকে। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল একবার ওর। নিজের চোখ দুটো ওড়নায় ঢেকে নিলে। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ফেরার পথে পা বাড়াল মায়ের হাত ধরে।

এর পর দিন-পনেরো আর বাইরে পা বাড়ায়নি একদম। কোনো জোয়ানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেনি। গুরুজনেরা ভাবল, মেয়ে বোধ হয় এবার শুধরে যাবে। মারাত্মক খেলার নেশা ছুটে যাবে হয়তো। কিন্তু সব ভুল। মেয়ে আগেকার নেশায় মেতে উঠল দ্বিগুণভাবে আরো।

উদাসদৃষ্টি মেলে ধরল আকাশে বৃদ্ধা। খানিকটা হাল্কা বাতাস টেনে নিল বুক ভরে। বৃদ্ধার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠছে। শুরু করবে বোধ হয় ফুল কাহিনী আবার। মাঝপথে কোনো প্রশ্ন করে বৃদ্ধাকে সচেতন করে দিতে মন চাইল না আমার, চুপ করেই রইলুম।

উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। বৃদ্ধা বলতে আরম্ভ করেছে।

বাবুসাব! ফুল ভালো হতে যে চেষ্টা করেনি একেবারে—তা নয়। ভালো হতে গিয়েও খারাপ হয়ে গেছল পূর্বের অভ্যেসের দরুন। যেখানে যাচ্ছি আমরা—সেখানে আসত ছোটবেলায় মাঝে মাঝে। দাদু সঙ্গে করে নিয়ে আসত বেড়াতে। নীল-লাল-হলদে-

সাদা-বেগুনী রঙের ফুলশয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত ফুল। ফুল যেন ফুলই হয়ে যেত। জেগে উঠে ভুন্দর নদীর ফটিক-জলে নিজের ছবি দেখত। দেখত নিজেকে, কত সুন্দর।

দাদু একগাল হেসে নাতনীর চিবুক ধরে বলত, বাগানের ফুল দেখতে আসে কত দেশ-বিদেশের লোক। আমার এ ফুলকেও দেখতে আসবে কত লোক। এ চোখ ডেকে আনবে অনেককে। পাত্র খুঁজতে হবে না আমাদের কোনোদিন। দাদুর তামাশার মর্মকথা বোঝেনি সেদিন আট বছরেব ফুল। কিন্তু মনে মনে ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল—চতুর্দিক থেকে আসুক অগুনতি লোক দেখতে তাকে। যাকেই দেখত তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত—দাদুর কথা সত্যি হয় কেমন দেখা যাক না—দেখা যাক না লোকটাকে কাছে আনতে পারে কিনা তার দু'চোখ।

মানসিক সাধনা সফল হয়েছিল ফুলের বছর ষোল বয়সে। ওই বয়সেই মোহনলালের মৃত্যুতে নিজের ভুল সাধনা থেকে সরে আসতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। ছুটে এসেছিল কাণ্ডোলিয়াসেইন-এ।

বিলেত থেকে মেমসাব এসেছে সেইন-এ। সেইন থেকে ফল চালান দিত মেমসাব বিলেতে। গাঁয়ের লোকদের ওপর তার সহানুভূতি ছিল অকৃত্রিম। রুগীদের ওষুধ দিত সেবা করত। তাদের জন্য ফুলবাগানে বসে প্রার্থনা করত। লোকের ভালোর চেষ্টা করাই যেন তার জীবনের মহাব্রত ছিল। লোকেরা তাকে মাদার দেবী বলে ডাকত।

মাদারের আশ্রয় নিয়েছিল ফুল। নিজের কথা সব জানিয়েছিল। গোপন করেনি একটুও। নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল দুর্মতি থেকে। বাঁচাতে চেয়েছিল অন্যকে তার খপ্পর থেকে। মাদার প্রার্থনা করতে উপদেশ দিয়েছিল। মন ঘোরাবার চেষ্টা করতে বলেছিল। বলেছিল, আমি আছি ভয় কি?

মাদারের আশ্বাসে সাহস পেয়েছিল মনে ফুল, কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারেনি তবুও। সরযূকে কাছে টেনে নাগমণিকে

ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল আবারো। ফুলের সামনেই সরযুকে শাসিয়ে দিল নাগমণি একদিন। ফুলকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা ভালো হচ্ছে না মোটেই। অসহ্য। মোহনলালের ব্যাপারটা এত শীগ্‌গির ভুলে যাওয়াটা আশ্চর্য ঠেকছে।

বুকটা কেঁপে উঠল ফুলের। হয়তো সরযূকে খেলাতে গিয়ে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিল। ওকে হারাতে চায়নি। সরযূর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার প্রতিজ্ঞা করেছিল মনে মনে।

মাদারকে ভালো লাগত ফুলের। দৌড়ে দৌড়ে যখন-তখন চলে যেত মাদারের কাছে। কিন্তু সেখানেও বাধ সাধল বিধি ওর ওপর। একদিন গিয়ে শুনল, ফুল তুলতে তুলতে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে মাদার। ভেঙে পড়ল ফুল। অন্ধকার দেখল চারদিক।

আশ্চর্যের বিষয় অন্ধকারেও আলো দেখতে লাগল মাঝে মাঝে। নাগমণি-সরযূর হাত থেকে পালাবার জন্য যখুনি মন অস্থির হয়ে উঠত খুব, তখুনি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করত সেইন-এর দিক থেকে। নিজের অগোচরে আচ্ছন্নের মতো চলে আসত সেইন-এ। মাদারের কবরের জায়গায় মাথা ছুঁইয়ে রাখত খানিক। মাদারের বলা কথাই শুনত যেন নতুন করে।—আমি আছি ভয় কি? বুকভরা শান্তির পরিতৃপ্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চমকে উঠত কিন্তু। সামনে দাঁড়িয়ে সরযু-নাগমণি আর ওদের সাঙ্গোপাঙ্গ। পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে উঠত রাগে। এ আপদদের হাত থেকে কি রেহাই নেই কোনোদিন। মুক্তি নেই কোনোদিন।

সত্যি সত্যিই মুক্তির পথ আবিষ্কার করে ফেলল নিজেই একদিন ফুল। সাফ বলে দিল সকলের সামনে সরযুকে বিয়ে করবে না কোনোদিন। নাগমণির হাত থেকে বাঁচুক সরযু। নাগমণিকেও বিয়ে করবে না জীবনে। নাগমণি খুনী।

নাগমণির মাথায় খুন চাপল ফুলের শেল-বেঁধানো কথা শুনে। ফুলকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে সে দুনিয়া থেকে।

কার কতো সাধ্যি দেখা যাক। রুখে দাঁড়াল এসে সরযু। বিষম

প্রমাদ গনল ফুল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সরযুর মৃত্যু। তার জন্যই সরযুকে মরতে হবে স্রেফ।

ফুল দেশ ছেড়ে পালালেই সব শান্তি। পালাবে কোথায়? চতুর্দিকে নাগমণির চর! তিন রাত জেগে কাটাল ফুল। কোনো আশার আলো দেখতে পেল না। তিন রাতের শেষ প্রহরে—ভোরের দিকে কেমন যেন তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব আসতে লাগল ওর। সেইন-এর অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল বার বার। সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল ডেরা থেকে। আচ্ছন্নের মতো চলছে ফুল।

দূরে—পাহাড়ের আড়ালে ওৎ পেতে বসেছিল দলবল নিয়ে নাগমণি। ফুলকে দেখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল বুকে-মাথায়। পা টিপে টিপে অনুসরণ করতে লাগল সকলে।

সেইন-এ এলো ফুল। মেমসাহেবের কবরমাটির ওপর চারকোণা শ্বেতপাথরটায় মাথা ঠেকিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল হঠাৎ।

চুপচাপ দেখল খানিক নাগমণি। চকচকে ছোরার বাঁটটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে এগুতে লাগল পায়ে পায়ে। হয়তো ফুলের গন্ধে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ফুল। এই তালে নিয়ে পালাতে হবে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বাধা দিলে, এই ছোরাই ব্যবস্থা করবে। লাশটাকে ফেলে দেবে ভুন্দর নদীর জলে। মুহূর্তে কোথায় ভেসে যাবে কেউ জানবে না। দিনের আলোয় ওর দেহটাকে কেউ দেখতেও পাবে না এখানে।

ফুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নাগমণি। চারদিকে ঘিরে ফেলেছে ওর লোকেরা। কোনো দিক দিয়ে না পালাতে পারে ফুল।

হঠাৎ চমকে উঠল নাগমণি। দু-হাতে চোখ রগড়ে নিল ভালো করে। ভুল দেখছে কিনা। না, ঠিকই দেখছে। ফুল নয়। মাদার শুয়ে আছে। মাদারের জ্বলন্ত দৃষ্টি ওর চোখ-মুখ ঝলসে দিচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে সর্বশরীর নাগমণির। ওর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাতাসে—গাঁয়ের মানুষের কানে কানে।

ছুটে এলো সকলে। সকলেই দেখল নাগমণিকে। দেখল মাদারকে।

এ-ও দেখল তারা - মাদার উঠে দাঁড়াল। ফুল হয়ে গেল আবার। কিন্তু এ ফুল যেন অন্য। আগের নয়। প্রায় মাদারের মতোই মুখ-চোখের আদল। সকলেই ভয়ঙ্কর ভয় পেতে লাগল। পালাতে লাগল সব যে যেদিকে পারল। ফুল ডাইনী। নানা রূপ ধরে। রটে গেল সব জায়গায়। সেই থেকে ফুলকে দেখতে পেলে দূরে পালিয়ে যায় লোক।

বুঝতে বাকি রইল না আমার যে এই ফুলকেই চড়ার উপর দিয়ে চলে যেতে দেখেছিল গাইড। দেখেছিল অন্যেরা। দেখেছিলুম আমি। কেন জানি নে একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। ফুলের অতীত যাতনা তোলপাড় করতে লাগল।

বাবুসাব! ফুলবাগানে এসে গেছি আমরা।

বৃদ্ধার ভেজা গলার আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেলুম যেন। এতক্ষণ পথের কোনো খেয়ালই ছিল না। বৃদ্ধার কথায় একাত্ম হয়ে গেছলুম। ফুল কাহিনীর রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। প্রত্যক্ষ করছিলুম যেন পর পর সব কিছু।

কৌতূহলী মনে প্রশ্ন উঠতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম বৃদ্ধাকে—ফুলের আগেকার অভ্যেস কি আছে এখনো?

না। পাল্‌টেছে। সম্পূর্ণ পাল্‌টেছে। সেদিনের ভোরে মাদারের কবরের চারকোণা পাথরটায় মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়বার পর থেকে।

বৃদ্ধার চোখদুটো জ্বল জ্বল করে উঠল আনন্দে।

অদ্ভুত লাগল বৃদ্ধাকে। অন্যের ভালো হওয়ায় কত না আত্মতৃপ্তি! প্রশ্ন করলুম, তুমি নিয়ে এলে—ফুলকে দেখতে পেলে—চোখাচোখি হলে কোনো অমঙ্গল হবে না তোমার।

ও যে আমারই মেয়ে বাবুসাব!

বিস্ময়ের বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার সর্বশরীরে। এত সরল এত ভালোমানুষ মায়েরও ও-রকম মনের মেয়ে হয়! অপলক চোখে দেখছি বৃদ্ধাকে। মেয়ের জন্য মায়ের ওপর দিয়ে কত না ঝড় বয়ে গেছে এক সময়। তাই কাহিনী বলার ফাঁকে ফাঁকে কেমন যেন হয়ে

যাচ্ছিল। নিজেকে মিশিয়ে ফেলছিল হয়তো অতীতের নির্মম পরিবেশের মধ্যে।

ফুলকে দেখবে না বাবুসাব? ভয় নেই। দেখলে কোনো অমঙ্গল হবে না।

ঘাড় নাড়লুম। বৃদ্ধার কথায় সায় দিলুম। অমঙ্গল হবে না জানি আমিও। চতুর্দিকে তাকালুম। কাউকে দেখতে পেলুম না। কেবল ফুল আর ফুল। নীলের সমারোহ একদিকে, লালের অন্যদিকে। হলদে-সাদার আবার কোণায় কোণায়।

বৃদ্ধার সঙ্গে চোখাচোখি হল। বলল, আরো ভালো করে দেখ বাবুসাব!

দেখলুম। তৃতীয় ব্যক্তিকে নজরে পড়ল না। হাসছে বৃদ্ধা। কৌতুকের হাসি। সন্দেহের দোলা লাগল মনে আমার। তবে কি গাইডের ধারণাই সত্যি হল! হয়তো চড়াই-এর উপরের তরুণী সত্যিই মায়াবিনী। বৃদ্ধার বেশে দাঁড়িয়েছিল পিছনে এসে। প্রতিটি রোমে রোমে একটা অজানা ভয় শিরশির করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ফুল ফুলের ভিতর রয়েছে বাবুসাব। ওকে ওপরে খুঁজলে পাবে না। দেখিয়ে দিচ্ছি। এদিকে এসো।

দাঁড়িয়ে আছি। আর এক পাও এগুতে মন চাইছে না। ওর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠছি। একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়াল বৃদ্ধা। ডান হাতখানা ধরল আমার। কেন জানি নে—বাধা দিতে গিয়েও পারলুম না। যাব না কথাটা বলতে গিয়েও মুখে আটকে গেল। আমি যেন আমার সমস্ত সত্তা হারিয়ে ফেললুম। বৃদ্ধা আমার হতে ধরে নদীর দিকে নিয়ে যেতে লাগল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলেছি আমি।

কিছুটা নীচের দিকে নেমে থামল। হাত ছেড়ে দিল। আঙুল দিয়ে ডানদিকটায় দেখিয়ে দিল। অবাক হয়ে গেলুম। সেই তরুণী, সেই গোলাপী-ঘাঘরা, সেই সাদা ওড়না! বৃদ্ধার মেয়ে ফুল। ফুলে ঢাকা ফুল। গাছের ফুলগুলো টুপ-টুপ করে ঝরে পড়ছে ওর সর্বাঙ্গে।

চোখ বুজে হাঁটু মুড়ে বসে আছে যেন একখানা শ্বেত-পাথরে খোদাই দেবী-প্রতিমা! '…যোয়ান মার্গারেট…' লেখা সামনের চারকোণা শ্বেত-পাথরটার ওপর দু'হাতের আঙুল ছুঁয়ে রয়েছে ফুলের।

বৃদ্ধার সম্বন্ধে একটু আগের ভুল-ধারণা ভেঙে খান খান হয়ে গেল নিমেষে।

পাছে ধ্যান ভেঙে যায়—নিশ্বাস বন্ধ করে ধ্যানমূর্তি দেখছি ফুলের। দেখছে ওর মা-ও। কার ধ্যান করছে ফুল? ফুলের মালিকের —বিশ্বপিতার? না বিশ্বপিতার সৃষ্টি তার ভাবপরিবর্তনের ধ্যানের অবলম্বন মাদারের? ফুলের মা-ও বোধ হয় জানে না কার!

ধীরে ধীরে দু'চোখ খুলল ফুল। দেবতার নির্মাল্য দুটি যেন ফুটে উঠল। আমাদের দেখতে পেয়ে হাসির ঢল নামল ওর শান্তসুন্দর মুখে। স্বর্গের স্নেহস্নিগ্ধ দীপ্তি ঝরে পড়ল বুঝি।

মুগ্ধচোখে দেখলুম, উঠে দাঁড়াল ফুল। ফুল বাগান থেকে বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে! সাক্ষাৎ দেবী চলে গেল যেন আমাদের পাশ দিয়ে।

জায়গাটার নাম মৌচি। উলফ্রাম ধাতুর খনি আছে। নাম মৌচি মাইন। ব্রহ্মদেশের এই মৌচি মাইনে যাবার রাস্তা পেগুয়োমারেঞ্জের ওপর দিয়ে। পাহাড় কেটে রাস্তা করা। দু'পাশে মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়। পাইনের সারি, সাল-সেগুনের মিতালী। মন্দ লাগে না পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে হেঁটে বা মোটরে করে যেতে। জায়গায় জায়গায় এত নির্জন যে, দিনের বেলায়ও নিশুতি রাতের মতো স্তব্ধ মনে হয়। কোথাও কোথাও ঘন জঙ্গল। খানিক দূরে দূরে ওভারসিয়ারদের কাঠের ডেরা।

মোটরে করে যাচ্ছি মৌচি মাইন দেখতে। সঙ্গে ছোট কাকামণি আর ছোট কাকামণির বড় ছেলে অপরেশ। অপরেশ আমি সমবয়সী। ছোট কাকামণির কাছে কিছুদিন বেড়াতে এসেছি। এখানেই তাঁর ব্যবসাস্থল। ছোট কাকীমা যেতে বারণ করেছিলেন। ঝড়বৃষ্টির দিন। আকাশের অবস্থাও ভালো নয়। সারাদিন যেন নতুন বৌয়ের চোখের তারায় জলের কণা টলমল করছে আর ঝরছে।

ছোট কাকীমার নিষেধে কান দিইনি। হাঁটতে-চলতে নিষেধ ওঁদের। তাছাড়া আমি বরাবরই একটু জেদী। বললুম, আজ যদি মাইনে দেখতে না যাওয়া হয়, তাহলে আমি এখানে থেকে আর কী করবো? কলকাতায় ফিরে যাবার আজ থেকেই বন্দোবস্ত করি না হয়। ছোট কাকীমা বললেন, সে কিরে! ছেলের কথা শোনো। ঝড় বাদলায় এখানকার রাস্তার অবস্থা কি হয়, তোর জানা আছে?

মা বিশবার করে বলে দিয়েছিলেন—যাচ্ছো যাও! গিয়ে যেন কাকা-কাকীকে উদব্যস্ত করে মেরো না আমাদের মতো।

মায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। আসবার সময় মায়ের চোখের ছল-ছল চাউনি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মায়ের

জাতের এই ধরে রাখার আকুতি সত্যিই কি দুর্বলতা? আমার অজ্ঞাতসারে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছিলো, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ অপরেশের কথায় চমক ভাঙলো। অপরেশ বলছে. মা! তুমি আর বাধা দিও না, ছোড়দা এবার বোধ হয় কেঁদেই ফেলবে!

আমি অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে নিতে বললুম, অপরেশ! আজ আমি মাইন দেখতে যাবো না রে! আমার শরীর ভালো নয়।

ওঁরা ভাবলেন, এ রাগের কথা, অভিমানের কথা। ভাবাটা দোষের নয়, এসে অবধি এই পাথর গলানো বৃষ্টির জ্বালায় দু'দিনও বেরুতে পারিনি। কাকামণি আশ্বাস দিলেন, ঝড় হোক, জল হোক, আজ তিনি আমাকে মাইন দেখতে নিয়ে যাবেনই।

মোটরের সামনে এসে কাকীমা আমাদের তুলে দিলেন। বারে বারে বলে দিলেন, অসমতল পাহাড়ী পথে রাত্তিরে যেন ফেরা না হয়। সকাল সাতটায় ওখান থেকে মোটরে চাপলে এখানে সন্ধ্যা সাতটায় ফিরবে।

মোটরে উঠে কাকীমার দিকে চেয়ে দেখি, তাঁর মুখখানি বড় শুকনো। মনে হল, তাঁর ভেতরে ভেতরে কি যেন একটা অস্বস্তি উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, শুধু কাকামণির ভয়েই কিছু বলতে পারছেন না। কাকাও আমার মতই জেদী। এখান থেকে—মানে টাংগু থেকে বেশী দূর নয় মাইন। অথচ কাকীমার এরকম দুর্বলতা কেন? ঝড়-বৃষ্টিতে কী লোক বেরোয় না! তাছাড়া এখানকার ড্রাইভার লোকটি তো কম এক্সপার্ট নয়!

গাড়িতে বসে বসে ভাবছি। গাড়ি এঁকে বেঁকে নানা ভঙ্গি করে হেলতে দুলতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, নাক ডাকিয়ে—জঙ্গলে শ্বাপদের খসখসানি আওয়াজ শুনে ফটফটিয়ে চলেছে। গাড়ির সঙ্গে আমাদেরও দেহের মনের সেই অবস্থা। কাকামণি সারা রাস্তা বলেই চলেছেন, তোর কাকীমার ঝড়জলের পাহাড়ী রাস্তায় বড় ভয়। সেইজন্তে মানা করেছিলো। ড্রাইভারকে খালি বলতে থাকেন,

হুঁশিয়ার হয়ে যেতে। ড্রাইভার জবাব দেয়, সে কত্তো বর্ষায় এই রাস্তা দিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। জীবনের তিরিশটি বর্ষার মধ্যে দশটি বর্ষা কেটেছে পাহাড় পথের যাত্রী বয়ে। এমন অভিজ্ঞতা না থাকলে কি আর, তাকে বাবুসাহেব নিতেন?

এখানে ছ'মাস ধরে যে বর্ষা চলে, আগে জানতুম না। ভেবেছিলুম, কলকাতায় বর্ষা গেছে, এখানেও বোধ হয় তাই। কী জ্বালা! আমারও চোখে জল আসতে লাগল। বৃষ্টির অনধিকার প্রবেশ রুখতে কাঁচ তুলে বসে থাকো। একটু মুখ বাড়িয়ে যে কিছু দেখবো, গাছ-গাছালি হাত দিয়ে ছোঁবো, সে সব কিছুই হচ্ছে না। ছোট কাকীমার কথা শোনাই উচিত ছিলো।

মনটা অবসাদে ভরে উঠলো। এখন তো আর ফেরা যায় না।

যাক। কোনোপ্রকারে মৌচিমাইনে পৌঁছলুম। কাকামণির জানাশোনা লোকের বাড়িতে, সে রাতের অতিথি হলুম আমরা। মন অস্বস্তিতে ভরপুর। রাতে ভালো ঘুম হল না। সকালে উঠে, পারমিশন নিয়ে মাইন দেখা হল বটে, কিন্তু কেন জানি না আনন্দ তেমন পেলুম না। ফেরবার ভাবনা পেয়ে বসলো। ছোট কাকামণি আর অপরেশকে তাড়াতাড়ি ফেরবার কথা বলায় দুজনেই নিরুত্তর। আকাশের একটা থমথমে ভাব হয়ে উঠছে। তাই কী এদের মুখে তার প্রতিফলন? কেন? যদি এত দুর্যোগই পাহাড়ী পথে — কাকামণির তো জানা উচিত ছিলো। তিনি প্রশ্রয় দিলেন কেন আমার জিদকে? এখন আমার ওপর রাগ করলে কী হবে? আমি কী জানি এখানকার কিছু? এখানে তো নতুন।

অপরেশ একটু বিরক্তির সুরেই বললে, ছোটদার সবেতেই তাড়া, আসতেও যেমন যেতেও তেমন! এখন পথে যদি ঝড়বৃষ্টি বেশী আসে তাহলে ফেরা যাবে কেমন করে?

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করি। সে বীরপুরুষ। বীরের মতোই উত্তর তার কাছ থেকে আশা করা ছাড়া আর কি শুনতে পারি? সে জানালে, কোনো ভয় নেই। অনেক আঁধার রাতে বিজলীর দাপা-

দাপিতে, পাহাড়ী ধসের মধ্য দিয়েও নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার সেই একমাত্র কাণ্ডারী। ব্রহ্মদেশে কে না তাকে চেনে। ঝড়ের রাতে পাগলা বাতাস সাল-সেগুনকে পাহাড় তলায় নামিয়ে দিতে চেষ্টা করে যখন, তখনও তার গাড়ি চালানোর কাছে হার মানতে হয়েছে সেই দুরন্ত বাতাসকে কতোবার।

সকাল আটটা নাগাদ যাত্রা শুরু হল। অবাক কাণ্ড, আকাশ তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আগের দিন গাড়ির বন্ধ কাঁচের পর্দা মুক্তি পেলো। আকাশে রোদ ঝলমল। বাংলার শরতের ছায়া। মনে মধুর আমেজ। চলেছি ফেরার পথে। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে গাছ-গুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি। পথ জুড়ে চলেছে আমাদের মোটর। চলার পথে বাঁকের কাছে সরে দাঁড়াচ্ছে আসার গাড়ির পথ করে দিয়ে। অনেক দূরে দূরে সানজাতিদের চা-বিস্কুট বেচার একটা করে খুপরি।

হঠাৎ দু'কান উৎকর্ণ।

আকাশে গুরু গুরু আওয়াজ। রোদঝরা আকাশে এ আবার কিসের গর্জন? ড্রাইভার নির্লিপ্ত মুখে জানালে, পাহাড়ী ধস নামার শব্দ ওটা। কাকামণি চমকে ওঠেন। বলেন—পথ দেখে, হুঁশিয়ার হয়ে! ড্রাইভারের পুরনো উক্তি। সাহসের ভাষণ। আমি একবার কাকামণির মুখের দিকে, একবার ড্রাইভারের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে থাকি।

ক্রমে আকাশ মেঘে ছেয়ে এলো। অপরেশের মুখ শুকনো। মামাবাবুর চকিত দৃষ্টি ড্রাইভারের দিকে। আমারও কি জানি এক অজ্ঞাত শঙ্কা, কতোক্ষণে কাকীমার কাছে ফিরবো। মোট কথা ওদের ওই বোকা রকমসকম আমার ভালো লাগছে না।

মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। গাড়ির মন্থরগতি। বর্ষার করুণায় পথ-ঘাটের বিপজ্জনক অবস্থার জন্যে অনেক সাবধানে আসা হচ্ছে। বারো ঘণ্টার জায়গায় চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা লাগবে যা দেখছি। তার ওপর আবার দুর্যোগের বেগ বাড়লো। কাকীমা বিশেষ করে বারণ করেছেন রাত্তিরে ফিরতে, মনের কোণে কথাগুলো খালি উঁকি

মারছিলো। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারছিনে। হাঁকু পাঁকু ভাব। আমিই তো যতো নষ্টের মূল।

তখন রাত আটটা। এমন জায়গায় এসে পড়েছি – বসতি শূন্য। হু'দিকে ঘন জঙ্গল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। খালি ড্রাইভার ছাড়া সকলেব মুখে-চোখে একটা আশু আশঙ্কার ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠছে। আমারও মনে তার দোলা লাগছে। ড্রাইভার বেপরোয়া। যতো দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে, তার পাহাড়ী মনের উদ্দামতা ততো বেড়ে উঠছে। ততো শীগগির ফেরবার তাগিদ যেন সে অনুভব করছে। কাকামণির কোনো কথাই তার কানে যাচ্ছে না। স্বপ্নরাজ্যের লোক হয়ে গিয়েছে। কিসের প্রেরণায় তার হাত ষ্টিয়ারিং ধরে মরণ খেলা করে চলেছে। অসহায় অবস্থা সবার। আমার শঙ্কাকুল অপরাধীমূর্তি, কিন্তু আপাতত আমার দিকে কারো চোখ দেবার মতো মনের অবস্থা নয়।

আমি কি দেখছি? মা-কাকীমার সজল চোখ দেখছি সর্বক্ষণ। বিদ্যুতের ভ্রূকুটিতে, গাছের পাতা বেয়ে জল পড়ায়, আকাশঝরা বারি ধারায় – সর্বত্র। বোঁ-বোঁ করে মাথা ঘুরছে। অস্ফুট স্বরে মুখ দিয়ে 'মা' কথাটা বেরিয়ে এলো। কাকামণি আমাকে জড়িয়ে ধরে গাড়ি থামাতে বললেন। কিন্তু কে থামাবে গাড়ি?

চেনা ড্রাইভার কাকামণির। কিন্তু একি! এতো অবাধ্যতা কিসের? সুযোগ পেয়ে এই বিপন্ন অবস্থায় কী বিপদে ফেলতে চায় আমাদের? চুরি ডাকাতি করবে? খুন করবে? হয়তো দূরে কোনো ঘাঁটিতে, কোনো আড্ডায় তার সমব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করছে। তা না হলে এতো আনন্দ তার চোখে-মুখে উপছে পড়ছে কেন? এতো সাহস কেন?

কারো মুখে কোনো কথা নেই। ড্রাইভারের গাড়ি চালানোর গতির সঙ্গে বয়ে চলেছি যেন শূন্যে ভেসে ভেসে। সময়ে মনে হচ্ছে ড্রাইভারও নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তাকে দিয়ে জোর করে কে যেন গাড়িটা চালাচ্ছে।

আবার গুরু গুরু করে আওয়াজ হল। এবারে আগের চেয়ে অনেক জোরে। মনে হল—আমাদের মোটর যেন পাহাড়ের গা থেকে খানিকটা

উঁচুতে উঠে জাম্প করলে। বুক কেঁপে উঠলো। অজানা বিপদের সঙ্কেতে তিনজনের জড়াজড়ি অবস্থা। বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। চোখ ঝলসে গেলো। ড্রাইভার এতোক্ষণে কথা কইলে—ভয় নেই। পাহাড় ধসেনি। এটা মেঘের ডাক।

যাক্, বাঁচা গেলো! এবার মোটরের হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একটা কালো মোষ জঙ্গলের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে। আমাদের মোটরের সামনে। হর্ণের আওয়াজ। হেড-লাইটের আলো। কিছুই তার গতিকে রোধ করতে পারছে না। এ কি! আজকের কালরাত্রি কী কাটবে না? এখনো বোধ হয় দু' ঘণ্টা বাকী টাঙ্গুতে ফিরে যেতে। এইখানেই কী কাকা-ভাইপোর সমাধি হবে? কিন্তু উপায় কি? মোষের এগিয়ে আসার গতিরোধ করা গেলো না। অ্যাক্সিডেণ্ট অনিবার্য, কারণ ড্রাইভারের যেন ওই মোষের সঙ্গেই রেষারেষি। থামার লক্ষণ নেই, দরকার হলে যেন ওটার হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েই এগোবে সে।

আমরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলুম, রোখো, গাড়ি থামাও! আর যেও না! যেও না! যেও না!!

নিবিড় অন্ধকার জনমানবহীন রাজ্যে একটা মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজ ঘুরপাক খেতে লাগলো। পাহাড়ী-জঙ্গল কাঁপানো 'যেওনার' বর্মী ভাষায়—মতোয়ানে! মতোয়ানে! মতোয়ানে!

ড্রাইভার তার জাতীয় ভাষার টানেই হোক বা যে কারণেই হোক গাড়ি থামালো। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। সামনে চেয়ে দেখি ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে, মোষটিকে সরাবার উদ্দেশ্যে, তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মোষটি যে ধার থেকে এসেছিলো, সেই ধারে চলার মোড় ফেরালে। ড্রাইভার মোষটি যেখানে দাঁড়িয়েছিলো, সেখানে যেয়েই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো একটা। সঙ্গে সঙ্গে আবারও চমকে উঠলুম আমরা। নেমে দেখি, সে জায়গাটি থেকে আঠারো-উনিশ হাত দূরে মরণ গহ্বরের মতো পাহাড়ী ধসনামা প্রকাণ্ড খাদ একটা!

বছর সাতেক কেটে গেছে। তবুও সেই মাস সেই দিন ঘুরে আসে যখন—অস্থিরতা বেড়ে ওঠে আমার। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে বিশেষ করে বুধবারে—নিজেকে ভুলে থাকতে ইচ্ছে করে। দুনিয়া ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। ভিতরে অসহ্য বোবা যন্ত্রণা। মাথা কুটে কুটে মরতে থাকে কেবল। বোঝে না কোনো যুক্তি। বোঝে না কোনো সান্ত্বনা। অতীতের সেই ছদ্মবেশী দিনই এর কারণ।

ওরকম সুন্দর দিনটার তলায় তলায় যে একটা অশান্ত দুর্দান্ত দানব আত্মগোপন করেছিল, তা টের পাওয়া যায়নি প্রথমে একটুও। অন্তত বেলা একটার আগে পর্যন্ত তো নয়ই।

ইয়োকোহামার ওপর সোনালী মিষ্টি রোদ ঝরে পড়ছিল তখন। রাস্তা-ঘাটে গিস গিস করছে লোক। একটি জাপানী বৃদ্ধা মহিলার দোকান থেকে শৌখিন লাইটার কিনলুম গোটা চারেক। আর কিছু কিনব কিনা ভাবছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ পিছনে এসে দাঁড়াল একজন সহকর্মী। হাঁপিয়ে গেছে। দৌড়ে এসেছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ জানাল—বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়তে হবে এখুনি। টাইফুন আসছে। মাথায় উঠল কেনাকাটা। কেনা লাইটার নিতে ভুলে গেলুম। সহকর্মীর সঙ্গে চললুম বন্দরের দিকে।

বন্দরে এসে দেখি, সমস্ত জাহাজই ছেড়ে গেছে। আমাদের সোলারকিংট্রা দাঁড়িয়ে আছে স্রেফ। দেখা হল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। হাত নেড়ে ইশারায় ডাকলেন আমায় উনি। এগুতে যাচ্ছি, আশ্চর্য হয়ে গেলুম বৃদ্ধা আর বৃদ্ধার জোয়ান ছেলেকে দেখে। জোয়ান ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, আমাদের পিছু পিছু এসেছে বৃদ্ধা। ছেলের মুখে শুনলুম বারণ শোনেনি মা। খদ্দেরের হাতে নিজে জিনিস তুলে দিয়ে নিশ্চিত হবে বলে এসেছে। ছেলেটি হেসে বলল, মা আমায় বাচ্চা ভাবে এখনো।

খুব ভাল লাগল বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধা যেন সব দেশের মায়েদেরই প্রকৃত মনের ছবি। দেশ ছাড়া হয়েছি অনেক দিন। বৃদ্ধাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে হতে লাগল বার বার। লাইটার চারটে তুলে দিল বৃদ্ধা আমার হাতে। সামান্য জিনিসের জন্য এতখানি কষ্ট করে এসেছে। কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো আমার। বৃদ্ধাকে বললুম, দোমো আরিগাতো। বৃদ্ধাও মাথা নীচু করে, ধন্যবাদ বিনিময় করল আমারই কথা কটা বলে।

এর পর ওরা চলে গেল ওদের গন্তব্যস্থলে। আমি চলে এলুম জাহাজে – মা-ছেলের মধুর স্মৃতি নিয়ে।

গভীর নীল সমুদ্রের বুকে প্রপেলারে জল কেটে কেটে আমাদের জাহাজ চলেছে দ্রুতগতিতে। চলেছে টাইফুনের বিপরীত দিকে- টাইফুন অতিক্রম করবার জন্য। আমাদের কাছ থেকে খানিক দূরে দূরে এগিয়ে চলেছে এক একখানি জাহাজ। ওগুলো বাঁচবে টাইফুনের হাত থেকে। আমাদের জাহাজের শেষ গতি কি হবে—বোঝা যাচ্ছিল না তখনও।

শক্তমনের শক্তমানুষ আমাদের ক্যাপ্টেন। প্রাণপণ চেষ্টা করছেন জাহাজ বাঁচাতে। বাঁচাতে গিয়েও, বাঁচাতে পারলেন না উনি জাহাজকে। টাইফুনের মৃত্যু আবর্তেই পড়ল জাহাজ শেষ পর্যন্ত। বুকের ওপর দিয়ে চলা হয় বলে যেন চাপা আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছে সমুদ্রের জল। সেকেণ্ড ডেক অবধি জল উঠছে। অসম্ভব দুলছে জাহাজ। আঠারো ডিগ্রী থেকে ষাট ডিগ্রী পর্যন্ত। কাত হয়ে পড়ছে। নিজেদের ঠিক জায়গায় ধরে রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঠিকরে পড়ছে ফ্লোরের ওপর অনেকে। গড়াগড়ি খাচ্ছে। ভীষণ অস্বাভাবিক অবস্থা জাহাজের। অগাধ জলের তলায় তলিয়ে যাবে বুঝি এখুনি।

জাহাজ ঘিরে তাণ্ডব চলছে বাতাসের। উপকূলের দিকে জলে ডোবা পাহাড়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে জাহাজকে। ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে। জাহাজের গতিবেগ চোদ্দ নটে তুলেও

রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। ছ' নট করে পিছিয়ে যাচ্ছে জাহাজ উপকূলেরই দিকে।

নির্ভীক ক্যাপ্টেন ব্রীজে দাঁড়িয়ে কণ্ট্রোল রুম থেকে পরিচালনা করছেন জাহাজ চালাবার—জাহাজ রক্ষা করবার।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওঁর দিকেই বেশী লক্ষ্য পড়ছে আমার। কোনো ভীতি দুর্বলতার ছাপ ওঁর মুখে ফুটে উঠতে দেখছি নে একবারের জন্যও। কি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন উনি। যুঝে চলেছেন সর্বগ্রাসী রাক্ষুসে ঝড়ের সঙ্গে।

ওঁকে দেখে মনে পড়ছে দীর্ঘদিন আগের কথা। টাইটানিক জাহাজের ক্যাপ্টেন স্মিথের কথা। নিজের দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করেননি তিনি! অন্যকে বাঁচিয়েছেন। বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন নিজে। দরকার হলে আমাদের ক্যাপ্টেনও তাই করবেন। সাক্ষাৎ স্মিথের প্রতিমূর্তি যেন ইনি।

দিব্যচক্ষে দেখছি যেন আমি আমাদের জাহাজের মৃত্যু। দেখছি ক্যাপ্টেনের মৃত্যু, দেখছি আমাদের মৃত্যু। এর আগে অনেকবার টাইফুনের মুখে পড়েছিলুম—এরকম মৃত্যুর বিভীষিকা এসে উকিঝুঁকি মারেনি মনের কোণে কখনো। এবারে কেন হচ্ছে—কোনো কারণ খুঁজে পেলুম না। ,কোনো জাহাজীর মনে এরকম আশঙ্কা হওয়া উচিত নয় জানি। তবু হচ্ছে। আর কটা ভয়েজের পর আমাকেও চীফ অফিসার থেকে ক্যাপ্টেনের মর্যাদার আসনে বসতে হবে কিন্তু আসনের মর্যাদা রাখবার মতো মনের দৃঢ়তা আমার গেল কোথায়! ছোটবেলায়—স্কুলে পড়েছিলুম ক্যাপ্টেন স্মিথের কাহিনী। ওই মহৎ কাহিনীই জাহাজী জীবনে আসবার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিল আমার। ক্যাপ্টেনের আদর্শই বা ধূলিসাৎ হতে চলেছে কেন আমার কাছে? মনকে সবল করতে চেষ্টা করলুম।

পারলুম না। সেই মুহূর্তেই আমাদের সামনের—এগিয়ে যাওয়া দুটো জাহাজ থেকে পর পর এস-ও-এস আসতে লাগল। চঞ্চল হয়ে উঠলুম আমরা—বাঁচাবার জন্য কি সাহায্য করতে পারি। আমরাও

তো নিরুপায়। আমাদেরও হয়ত এস-ও-এস পাঠাতে হবে এখুনি অন্য জাহাজে।

আগের জাহাজ দুটো জলে ডোবা চোরা পাহাড়ের চোরাগোপ্তার ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গেল। মৃত্যুপথের যাত্রীদের কাতর আর্তনাদে ভরে উঠল টাইফুনের বাতাস। ঘুরতে লাগল আমাদের চতুর্দিকে। নির্ঘাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব দুনিয়া থেকে এবার আমরাও।

মেঘে ঢেকে আছে আকাশ। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ক্যাপ্টেনের মুখখানা দারুণ কঠিন হয়ে উঠেছে। চরম মুহূর্তের সঙ্গে শেষ মোকাবিলা করবার জন্যও প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন উনি। কিন্তু আমি যেন কেমন হয়ে যেতে লাগলুম। ভুলে গেলুম জাহাজের পরিস্থিতি পরিবেশ, ভুলে গেলুম প্রাণঘাতী টাইফুনের দাপট। মৃত্যুভয়। মায়ের কাছে যাবার জন্য—মাকে কাছে পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল ভিতরটা।

মাকে দেখলুম স্পষ্ট, দেখলুম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাভাবিক হয়ে উঠলুম ধীরে ধীরে। দেখতে পেলুম না আর মাকে। দেখলুম, ক্যাপ্টেনের মুখে হাসি। সহকর্মীদের মুখে হাসি। বিজয়ীর হাসি সবার মুখে। মৃত্যুকে জয় করেছি আমরা। টাইফুনের সর্বনেশে কবল থেকে বেরিয়ে এসেছি। বেরিয়ে এসেছে আমাদের জাহাজ, বেঁচে গেছে জাপানের মেশিনগুলো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল সকলে। আনন্দ আমারও হচ্ছিল। কিন্তু মাকে দেখলুম কেন—এই কথাটাই বেশী সময় তোলপাড় করতে লাগল ভিতরে। নিজেকে নিজেই বোঝালুম, মাকে দেখবার প্রবল ইচ্ছাটাই হয়ত দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়েছে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মা।

বাড়ি থেকে চিঠি পাবার পর এ যুক্তি আমার টিকল না, নস্যাৎ হয়ে গেল একেবারে। আমি স্তম্ভিত। যে সময়ে আমি মাকে কাছে পেতে চেয়েছি—দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি—ঠিক সেই সময়ে মা-ও আমার কাছে আসবার জন্য মরণ জিদ ধরেছিল।

জিদ ধরতে বারণ করেছিল মাকে বৌদিরা। এখন ঠাকুরপোর কাছে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ওসব চিন্তা একেবারে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। হার্টের অসুখে কোনো উত্তেজনাই ভালো নয়।

ভেজা গলায় বলেছিল মা, কি দয়ামায়াহীন লোক গো তোমরা। আমি যে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছি মহাবিপদে পড়েছে খোকা। আমি যে শুনলুম ওর গলার আওয়াজ! আমাকে ডাকছে। আমি যাবই।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ছিলেন—জোর করে চেপে শুইয়ে দিয়েছিল বৌদিরা। ভেবেছিল, মা প্রলাপ বকছে। ডাক্তারকে খবরও দিয়েছিল। ডাক্তার আসবার আগে চলে গেল মা।

এতক্ষণ ধরে বলে চলছিলেন মিঃ মুখার্জি। থামলেন। বাইরে মেলে ধরলেন উদাসদৃষ্টি কিছুক্ষণ। আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন আবার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অস্ফুটে বললেন, হয়ত আমার ডাকাডাকিতেই অত তাড়াতাড়ি চলে গেল মা। তবে একটা বিষয় আমার কাছে আজো আশ্চর্য লাগে খুব।

যখুনি বিপদের মুখে পড়েছি—মনোবল হারাইনি একটুও। দ্বিগুণ শক্তি পেয়েছি নতুন করে। মনে হয়েছে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝি মা।

বিপদ কেটে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

পালিশ করা কাঠের পুব দেওয়ালে ঝুলছে ফোটোটা। সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো। মিঃ মুখার্জির দৃষ্টি আটকে পড়ল ওখানে। বললেন, আমায় জোর করে ধরে, মায়ের পাশে দাঁড় করিয়ে তোলানো হয়েছিল।

দেখছি আমি ফোটো। দেখছি মিঃ মুখার্জির মুখখানা। কেবিনে আসবার পরও হাসিখুশি ছিলেন উনি। এখন বেশ কাতর দেখাচ্ছে।

এর জন্য দায়ী আমিই। ডকে—সোলারডায়েল জাহাজ দেখতে এসে, ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছলুম ওঁকে জাহাজেই। কি জানি কি সুনজরে দেখেছিলেন উনি আমাদের। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই, জাহাজের

নীচুতলা থেকে উঁচুতলা অবধি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছেন সকলকে। একটুও ক্লান্তি বিরক্তি বোধ করেননি একবারের জন্যও। জাহাজের যন্ত্রপাতি-খুঁটিনাটি বিষয়ে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন হাসিমুখে।

সোলারকিং-এর চীফ অফিসার মিঃ মুখার্জি—সোলারডায়েলের ক্যাপ্টেন আজ। ওঁর মতো পদমর্যাদার লোকের এতখানি সাহায্য পাব - কল্পনাও করতে পারিনি।

নিজের কেবিনে নিয়ে এসে বসিয়েছেন আমাদের। বাধা দেওয়া সত্ত্বেও জলযোগের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এরকম অমায়িক লোকের জমা ব্যথাটাকে অজ্ঞাতেই নাড়া দিয়ে ফেলেছিলুম। ওঁর জাহাজী জীবনের কোনো বিশেষ ঘটনা জানতে চেয়েছিলুম।

মিঃ মুখার্জি জানালেন মর্মবেদনার কথা।

ফোটোটার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছেন। অস্বস্তিবোধ করছি আমি। ওঁর মনটাকে অন্য প্রসঙ্গে টেনে আনবার জন্য বললুম, এবারে কোথায় যাচ্ছেন ? কি মালপত্র নিয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে।

সম্বিৎ ফিরল মিঃ মুখার্জির। ফোটো থেকে দৃষ্টি ঘুরল আমাদের দিকে। মৃদু হাসলেন। বললেন, আইরণ-ওর নিয়ে ইয়োকোহামায় যাব।

বুকটার ভিতর কেঁপে উঠল আমার। আবার সেই জায়গায় !

কেন জানি নে ফোটোটার দিকে লক্ষ্য পড়ল আবার। বাচ্চা মুখার্জির হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মা।

···মানুষটার দু'চোখের ভিতর যেন একটা অজানা রহস্য লুকোনো ছিল। ওর চাউনির ধরনধারণ দেখে আমার মনে হয়েছিল তাই।

প্রথম দিন যখন আমি ওকে দেখেছি, স্তব্ধবিস্ময়ে দেখেছি। মুখে কোন কথা সরেনি আমার। সরেনি মানুষটারও। পথে ওরকম সময় বেরোয় না কেউ, ও বেরিয়েছে। জনপ্রাণীশূন্য রাস্তায় এসেছে একলা. আপাদমস্তক বর্ষাতিতে মোড়া। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। তীরের মতো বরফ বৃষ্টি হচ্ছে আর রক্ত জমাট করা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু-হু করে। অথচ কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপই নেই। আমার ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

কাঁচের জানলা দিয়ে দেখছি আমি। আমার জানলার দিকেই একদৃষ্টে ও তাকিয়ে আছে। দুর্যোগের ভোরে পথহারা লাজুক পথিক ভেবেছি আমি। ভেবেছি, আশ্রয় চাইতে এসেও হয়তো দ্বিধাসংকোচ করছে লোকটা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ভিতরের লোকের ডাকার প্রতীক্ষায়।

তাড়াতাড়ি' দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ওকে ডাকলুম। ভিতরে আসতে বললুম। মনে হল ও বধির। আমার কোন কথাই ওর কানের পরদায় পৌঁছল না। আশ্চর্য হয়ে গেলুম, ইশারাও বুঝল না। যা-ও বা দাঁড়িয়ে ছিল, আমার বলার আর ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে হনহনিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

পরদিন এল আবার একই সময়ে। নির্মেঘ নীল আকাশ; সোনা-গলা রোদ ঝরে পড়ছে আমাদের লনে। দোতলা কাঠের বাঙলোর ওপর। চিরগাছগুলোর মাথায় মাথায়। দুর্যোগ নেই তাই বর্ষাতিটা গায়ে দেয়নি সে। হাতে রেখেছে।

ওকে দেখেই কেন জানিনে ভিতরে ভিতরে একটা অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া

শুরু হতে লাগল আমার। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। বহির্বাস ফেরাণ্ডটা আমার সর্বশরীরে জড়ানো। হাড়-কন্‌কনে ঠাণ্ডায় রক্তের তাপ বজায় রাখতে ফেরাণ্ডের তলায়—বুকের কাছে আগুনচাপা কংগড়টা ঝুলছিল। ওটা যেন বড্ড বেশী ত্বলে উঠল।

কিছু বলে কোন ফল হবে না তা আগের দিনেই বুঝেছি। তাই কথা কইবার ইচ্ছে হল না আমার। ডাকতেও ইচ্ছে করল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ লক্ষ্য করছি, বুকটা ঘনঘন ওঠানামা করছে ওর। মুখচোখের ভাব যেন কেমন কেমন হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় ও দাঁড়াতে পারল না আর বেশীক্ষণ। বিত্নৎগতিতে ছুটে গেল যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকেই।

লোকটার ত্ব'দিনের ব্যাপার দেখে হতভম্ব আমি। ওর সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে মনে নানা রকম। কে, কেন আসে, এমন কেন—এ চিন্তা মন থেকে সরাতে বেশী দেরী হয়নি আমার। আমার গরীব অবস্থাটাই চেতনা দিয়েছে আমায়। আজেবাজে চিন্তার চেয়ে পেটের চিন্তা করলে বরং অন্ন জোটবার উপায় একটা না একটা বেরিয়ে পড়বে।

পেটের ধান্ধায়ই এসেছি আমি গাঁও ছেড়ে পহালগামে। যে কাজ করতে নামছি, যে কাজ শিখেছি. সে কাজ আমাদের খানদানী বংশের মানমর্যাদা হানি হবার পক্ষে যথেষ্ট। এই কারণেই দেশে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিনি আর। কাজের সংকল্প স্থির করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছি।

যাঁর কাছে এসে উঠেছি, তিনি আমাদের দেশেরই লোক। নতুন বাঙলো কিনেছেন। আমার কাজ-মনোভাব জানতেন দেশে থাকতেই। তিনি সংস্কার মুক্ত মানুষ বলেই আমার কাজে উৎসাহ দিয়ে বলে এসেছিলেন, দরকার হলে এস! ছেলের মতো আশ্রয় পাবে। কাজ দেখেশুনে ঠিক করে নেবে'খন একটা।

ত্ব'দিন এসেছি সবে। সারাক্ষণ কাজেরই চেষ্টা চলছে আমার। পাচ্ছিনে। পাবার আশায় বুক বেঁধে আছি। কারণ কথা দিয়েছে অনেকে।

ছোটবেলায় ঝিলাম নদীর কিনারে গিয়ে বসে থাকতুম, আর দেখতুম, বাতাস-জলের মিতালিতে কত বিচিত্র ধরনের নক্‌শা ভেসে উঠছে। বাবা বলতেন, এই দেখেই এখানকার কাশ্মীরী শালের ওপর কল্কা তোলার কাজের প্রেরণা এসেছে প্রথমে।

তন্ময় হয়ে জলের খেলা দেখতুম আর ভাবতুম, আমি কল্কা তোলার কারিগর হব। ছোটখাটো নয়, বড়। খুব বড়। এটা ভাবতেও আমার বুকের তলায় অপরিসীম আনন্দের ঢেউ খেলে যেত ঝিলামের স্বচ্ছ ঢেউয়ের সঙ্গে। অনেক রকমের কল্কার নক্‌শা ফুটে উঠত মনের পরদায়।

কপর্দকহীন অবস্থায় এসেছি পহালগামে। বাঙলোর মালিক কাজ না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের ভার না নিলে, দুর্গতির শেষ থাকত না আর আমার।

আমার ভিতর বলতে লাগল, লোকটার ব্যাপার নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না তুমি। আদার ব্যাপারী হয়ে অত জাহাজের খবরে দরকার কি তোমার? তার চেয়ে নিজের চরকায় তেল দাও।

ভিতরের কথা শুনলুম আমি। তবু বাইরের লোকটার হাত থেকে রেহাই পেলুম না। পাবার কোন সম্ভাবনাও দেখলুম না।

রোজ সকালেই ও আসবে। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করেই আসবে। নীচের—আমার ঘরটার দিকেই যত লক্ষ্য ওর। বাঙলোর দোতলার দিকে অথবা অন্য ঘরের দিকে ভুল করেও ফিরে তাকায় না একবারও।

দারুণ অস্বস্তিবোধ করি ও এলে। ঠিক কাজের চেষ্টার জন্য বেরুবার মুখে, মূর্তিমান বাধার মতো এসে সামনে দাঁড়াবে। ঘরটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে ধরবে। আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে আপদ। ওর নির্বাক মুখ দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছি সময় সময়। সংযমের বাঁধ ভেঙেছে আমার। জিবের লাগাম টেনে কথা কইবার খেয়াল থাকেনি। জানি, বলার মূল্য নেই কোন। তবুও চড়া মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্য কড়া করেই দুকথা শুনিয়ে দিয়েছি।—এভাবে

রোজ এসে এখানে কি দেখেন ঘরের দিকে? ভদ্রতারও তো একটা সীমা থাকা দরকার। জিজ্ঞেস করলে তো অহংকারে উত্তরই দেন না।

অপর পক্ষ কোন বাদপ্রতিবাদ না করেই নীরবে হনহনিয়ে চলে গেছে।

লোকটার চালচলন মনে হয়েছে রহস্যময়।

আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি আরো। ও এলেই যেন আমি দ্বিতীয় কারো অস্তিত্ব অনুভব করেছি আমার ঘরের ভিতর। ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অস্তিত্বও সরে গেছে যেন।

প্রথমে ভাবতুম মনের ভুল। লোকটার ওপর বিরক্তি-রাগেরই ফল এটা। মনটা ভারী হয়ে ওঠে ওকে দেখলেই। তার ভাবটাই দ্বিতীয় কারো অস্তিত্ব অনুভবের কল্পনা স্রেফ।

'কল্পনা-কল্পনা' করে মনকে হাজারো বার বুঝিয়েও দ্বিতীয় অস্তিত্বের হাত থেকে মুক্তি পেলুম না আমি কিছুতেই। মনের কাছে নতি-স্বীকার করতে বাধ্য হলুম। ও আসার সঙ্গে কে যেন আসে, যাওয়ার সঙ্গে চলে যায় আবার। এটাই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে উঠল আমার।

এর পর ভুললুম আমি নিজের কাজকর্ম। ভুললুম কি করতে এসেছি এখানে। কেবলি লোকটার চিন্তা পেয়ে বসল আমায়। আগের রাতে চুল্লীতে কাঠ গুঁজে ঘরের আগুন ঠিক রাখতে রাখতে মতলব ভেঁজে রাখতুম। কাল ভোরেই ওকে অনুসরণ করব। কোথায় বাড়িঘর দেখে নোব। তারপর লোকটার সম্বন্ধে তল্লাশ চালিয়ে যাব ভিতরে ভিতরে। কিন্তু সব চিন্তাই ব্যর্থ হয়ে যেত আমার ওর চোখে চোখ পড়লে।

রাতের স্বপ্ন যেমন ভোরে মিথ্যে তেমনি আমারও রাতের সংকল্প ধূলিসাৎ হয়ে যেত ও এসে সামনে দাঁড়ালে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চুপ করে দেখতুম শুধু। আমি যেন নিস্পন্দ পাথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতুম। পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে থাকত আমার। ওর কাছে যাওয়া তো দূরের কথা—এক পাও এগুতে পারতুম না।

আমি এগুতে পারলুম না বটে, কিন্তু ওই এগিয়ে আসতে লাগল এর পরে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখার পর্ব শেষ হল। একেবারে দরজায় এসে হানা দিল। মুখ গলিয়ে ভিতরটা দেখে নিত বার দুয়েক। কি যেন দেখতে চেষ্টা করত ও। তারপর ওর একটা উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস আছড়ে এসে পড়ত আমার গায়ে। চমকে উঠতুম আমি। ততক্ষণে ও 'যথা পূর্বং তথা পরং' নীতিই অবলম্বন করে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে চলে যেত।

কিরকম যেন একটা আচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন ভাব সর্বশরীরে ছেঁকে ধরত আমার। আমি যেন কেমন হয়ে যেতুম কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে আসতুম আবার স্বাভাবিক অবস্থায়।

সকাল বেলাটায় ওকে নিয়ে একটা নেশায় বিভোর হয়ে থাকতুম। ও এলেই পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠত। মন বদলাতে শুরু করত আমার। বেশ বুঝতে পারতুম একটা কিছু করবার প্রবল ইচ্ছে পেয়ে বসছে আমায়। একটা অজ্ঞাত উত্তেজনা তোলপাড় করছে ভিতরে। 'কি করি কি করি' ভাবটা কুরে কুরে খাচ্ছে বুঝি সমস্ত মাথাটাই আমার। অসহ্য যন্ত্রণা।

এই অসহ্য যন্ত্রণাটাকেই শেষে হয়তো ভালোবেসে ফেলেছিলুম আমি। তা' না হলে ভোরের আলো পৌঁছবার আগেই রাতের অন্ধকার থাকতে ঘুম ভেঙে যেত কেন? জেগে উঠতুম কেন? দরজার গোড়ায় ওরই প্রতীক্ষায় বা দাঁড়িয়ে থাকতুম কেন?

এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতে যেতুম আমি মাঝে মাঝে ওপরতলায়। বাঙলোর মালিকের কাছে। গেলে কি হবে? কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই মাথাটা গুলিয়ে গেছে অমনি। সব ওলটপালট হয়ে গেছে। কি বলতে এসেছি, কেন এসেছি—সব ভুলে গেছি মুহূর্তে। নিজের কাছেই নিজেকে আশ্চর্য ঠেকেছে কেমন। পালিয়ে আসতে পথ পাইনি।

সিঁড়ি বেয়ে নামার মুখে মালিকের কণ্ঠস্বর শুনেছি। চলে যাচ্ছ কেন? কিছু কি বলতে এসেছিলে?

অপ্রস্তুতে পড়ে গেছি খুব। কি উত্তর দিই—খুঁজে কিছু পাইনি। মিথ্যে বা যা তা বলা-শোনা ধাতে সয় না মোটে আমার। নিজের কানে নিজের খটকা লাগলেও, অগোচরেই মুখ দিয়ে মিথ্যে কথাই বেড়িয়ে এল, কিছু না। এমনি এসেছিলুম।

অদ্ভুত মানুষের সংস্পর্শে যেন আমিও অদ্ভুত চরিত্রের হয়ে উঠতে লাগলুম দিন দিন। সদাসর্বদা আনমনা-আনমনা ভাব। স্বতন্ত্র সত্তা বলে কিছু নেই যেন আর আমার। ওর কব্জায় চলে গেছি সম্পূর্ণ। অথচ দিন দশেক কেটে গেল, এর মধ্যে একবারের জন্যও ভুল করে চেয়ে দেখেনি ও আমার দিকে। দেখেছে শুধু আমার ঘরখানা। ওই দেখতেই আসে ও। সত্যিই ও বোবাকালা কি না, সত্যিই মাথা খারাপ কি না, সত্যিই কোন বদ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে কি না—এ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারিনি আমি। ওর বিষয় চিন্তা করলে, কিছু জানবার কৌতূহল হলে ঘুম ঘুম ভাব এসে যায় তখুনি। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার জীবনে।

ভিতরটায় ভাঙাচোরা শুরু হয়েছে আমার। বেশ বুঝতে পারছি, জীবিকার তাগিদে এসে একটা অজানা সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েই চলেছি। এ পথের দুর্বার আকর্ষণ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করতে পারবে না আমাকে কেউই। এই ভাবেই নিঃশেষ হয়ে যাব বোধ হয় একদিন দুনিয়া থেকে, নয়তো পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াব পথে পথে।

অভাব-অনটনে মানুষ আমি। কেটেছে অনাহারে, কেটেছে অর্ধাহারে অনেক দিন। এরকম ভাবে মনের বিপর্যয় ঘটেনি এর আগে একদিনের জন্যও। মন ভাঙছে। টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে অথচ প্রতিকারের উপায় নেই কোন। কাউকে বলবার উপায় নেই, জানাবার উপায় নেই। সেখানে মুখবন্ধ একদম। এই শ্বাসরুদ্ধ মৃত্যুর কবলে যেতে চায় না সহজে কেউ। আমিও যেতে চাইনি। মনের জোর কমে গেলেও, বাঁচতে চেয়েছিলুম। যেখানে দু' চক্ষু যায়, পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে। সাক্ষাৎ যমদূত আগন্তুকের কবল থেকে মুক্তি পেতে।

কিন্তু পালানো হল না আমার। মুক্তি পেলুম না আমি।

আমার চিন্তাভাবনা নেপথ্যে বসে বসে বুঝেছিলেন বুঝি বিধি। হয়তো কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল তাঁর সে-সময় মুখেচোখে। আরো বিচিত্র অভিজ্ঞতার কঠিন সুতোয় আষ্টে-পৃষ্ঠে তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করলেন তিনি এবারে আমায়।

যে ঘটনা ঘটিয়ে তিনি বাঁধলেন আমায়, আমি সে-ঘটনায় বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেলুম। খানিক সময়ের জন্য যেন এক অজানা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করলুম। স্বপ্ন ভাঙতে, সম্বিৎ ফিরতে দেখলুম, সব সত্যি। যা কিছু করেছি, যা কিছু দেখেছি, মিথ্যে নয় কোনটাই। সমস্ত সত্যি।

সত্যিই সেদিন রাত না পোহাতে কে যেন আমায় এক রকম ধাক্কা মেরেই তুলে দিয়েছিল বিছানা থেকে আচমকা। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছিলুম আমি। মানুষটার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে ভুলে গেছলুম। ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেছি। ছুটেছি সামনের দিকে। ছুটেই চলেছি। চিরগাছটার নীচে আসতেই হঠাৎ পা দুটো অবশ হয়ে এল আমার। যন্ত্রের মতো চলছিলুম আমি, যন্ত্রের মতোই থেমে গেলুম। আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করে ফেললুম আমি। চুরি।

চুরির ওপর দারুণ ঘেন্না ছিল আমার। ছোটবড় সকলকে বিজ্ঞের মতো বরাবর উপদেশ দিয়ে এসেছি, চুরি করবার চেয়ে মরণ হওয়া ভালো। অথচ নিজের নীতি নিজেই ভাঙলুম আমি চুরি করে, না মরে।

কোন শিল্পী তাঁর ছবি আঁকার সরঞ্জাম রেখে কোথায় গেছলেন সেই মুহূর্তে জানিনে। আমি আত্মসাৎ করে নিলুম নির্দ্ধিধায় তাঁর সেই সব সম্পত্তি। উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা শুরু হল আমার। এবারে ঘরের দিকে। ফিরে এলুম আমি ঘরে আবার।

এর পর কতক্ষণ ধরে কি যে করেছি আমি—কিছুই জানিনে। কোন খেয়ালই ছিল না আমার। খেয়াল হল, একটা অন্তর

ওপচানো আনন্দের স্বর কানে যেতে।—পেয়েছি, পেয়েছি। সচেতন হয়ে উঠলুম আমি। সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে আগন্তুক। ক্যানভাসে আঁকা একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণীর ছবি তুলে নিচ্ছে সযত্নে দু'হাতে।

স্বপ্নের ঘোর আমার কাটছে। কাটল। স্পষ্ট দেখলুম আমি, ছবিটা নিয়েই দৌড়ে বেরিয়ে গেল মানুষটা ঘর থেকে।

তারপর থেকে আর কোন ভোরেই আসেনি ও। প্রয়োজনও ছিল না কোন। যা খুঁজতে আসত, পেয়ে গেছে।

প্রেমার ছবি পেয়ে গেছে অমরনাথ।

সকলেই বলেছিলেন অমরনাথকে, প্রেমাকে ভুলে যাও। ওকে মন থেকে মুছে ফেলে দাও একেবারে। যে 'জীবনে ছাড়বে না কখনো' বলেও ছাড়তে পারে, তার মতো বিশ্বাসঘাতিনী মেয়ে নেই আর দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি।

সবার মুখের দিকে বিষণ্ণচোখে তাকিয়েছে অমরনাথ শুধু। কয়েক মুহূর্ত। তারপর বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলে গেছে সেখান থেকে চক্ষের নিমেষে!

বুক ফেটে যাচ্ছে প্রেমার জন্য অমরনাথের। কিন্তু মুখ ফুটে একটা কথাও বেরোয়নি কারো কাছে। অবুঝদের বোঝাবে কি সে! যদি ওরা প্রেমার মন জানত, প্রাণ জানত, বিশ্বাসঘাতিনী বলবার আগে অন্তত বুকটা কেঁপে উঠত নিশ্চয়। কাঁপেনি এদের। প্রেমা যে বিশ্বাসঘাতিনী নয়, শুধু অমরনাথেরই প্রেমের ভিখিরী—এটা বোঝাতে যাওয়াও পাগলামি।

অমরনাথ জানে, প্রেমা তার প্রাণে প্রাণে মিশে আছে। তাকে ছেড়ে যায়নি কোথাও। যাবে না কখনো।

প্রেমার চিন্তায় দিনরাত তন্ময় হয়ে থাকে অমরনাথ। সবার সঙ্গে কথা বন্ধ। প্রেমাকে দিয়ে অন্তর সাধনা চলল ওর নিভৃতে। বাইরে বড্ড দেখবার ইচ্ছে। অন্তরের ডাকে একদিন না একদিন সাড়া দেবেই ও। লুকিয়ে থাকতে পারবে না এভাবে কিছুতেই। সামনে এসে দাঁড়াতে হবেই ওকে।

প্রেমাকে সামনে আনার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে অমরনাথ প্রতি পদে পদে। তবুও বিশ্বাস হারায়নি। উদ্দেশ্য থেকে একচুল সরেনি।

সরেনি বলেই শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের গাই হাসপাতালে যেতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্য।

শাল ব্যবসায়ী ধনী বাপের একমাত্র আহুরে হুলাল অমরনাথ। ছেলেটা কত না হাসিখুশি ছিল একসময়। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড়ে মেতে থাকত দিনরাত। বাকপটুতার জন্য ওর খ্যাতি ছিল চতুর্দিকে। সেই ছেলের এ কি অবস্থা! একেবারে বোবাকালা যেন। কিছু শুনতে পায় না। কিছু বুঝতে পারে না। কিছু বলতে পারে না। প্রেমার বিরহে ও জীবন্মৃত। কাছে কেউ গেলে চিনতেও পারে না। চাউনি দেখে মনে হয় তাই। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

ডাক্তার-বৈদ্যরা শত চেষ্টা করেও অমরনাথকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। স্বাভাবিক করে তুলতে পারলেন না। একবাক্যে তাঁদের রায় শোনালেন অমরনাথের বাবাকে। এখানে সারছে না। সারবে না। লণ্ডনের গাই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলে নিশ্চয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে ও। মনের রোগ সারাবার উপযুক্ত জায়গা ওটা। অনেকে ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। প্রমাণ আছে বহু।

প্রমাণ থাকলেও কি সর্বক্ষেত্রে সবকিছু ফলবতী হয় সবার? হয় না, ব্যতিক্রমও ঘটে। ব্যতিক্রম ঘটল অমরনাথের বেলায়ও। গাই হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়নি একটুও। বরং আরো যেন কেমন হয়ে গেছে।

ফিরিয়ে আনা হল কাশ্মীরে আবার অমরনাথকে।

প্রথম প্রথম চোখে-চোখেই রাখতেন ওকে বাবা। উনি লক্ষ্য করতেন, বাড়ি থেকে বাইরে বেরুবার ঝোঁকটাই যেন প্রবল হয়ে উঠছে ছেলের। আটকালে ক্লান্ত হয়ে পড়ে খুব। অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কেন অসুস্থ হয়ে পড়ে—বাবা বুঝেও যদি না বোঝে—কি করতে

পারে অমরনাথ ? মনে-জ্ঞানে জানে, কেন অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। বাবার এইভাবে তাকে আটকে আটকে রাখাটাই কাল – যত নষ্টের মূল, যত অসুখের কারণ। দু'চোখের কোণ সিরসির করে ওঠে অমরনাথের। বাবা যদি দিল্লী নিয়ে গিয়ে না আটকে ফেলত তাকে, তাহলে প্রেমা লুকোবার সুযোগ পেত না হয়তো তার কাছ থেকে।

প্রেমার না লুকিয়ে উপায় ছিল না বাবার দৌরাত্ম্যের দাপটে।

প্রেমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল অমরনাথ। বাবাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না জীবনে কখনো। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভিতরের ভাবটাও বুঝতে চেষ্টা করেছিল বাবা। মুখখানা খুব গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, মুখের রঙটা সিঁদুর বর্ণ হয়ে গেছিল। রাগে কাঁপছিল সর্ব-শরীর। বিকৃতস্বরে বলেছিল, লজ্জা করছে না বলতে। চন্দনবাড়ি যাবার রাস্তায় বসে বসে যে মেয়ে রুটি বেচে দিন গুজরান করে—তাকে বিয়ে করবে তুমি খানদানী ঘরের ইজ্জৎ ডুবিয়ে ?

মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল অমরনাথ। মাথা তুলল। মুখ খুলল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, ওকে বিয়ে করবই আমি। গরীব হলেও খানদানী ঘরের লোকেদের মনের চেয়ে ওর মন অনেক পবিত্র অনেক বড়।

'অনেক পবিত্র অনেক বড়' কথাটা বার দুয়েক উচ্চারণ করল বাবা। তারপর যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বলল, ঠিক আছে। ওর সঙ্গেই বিয়ে হবে তোমার। নিশ্চিন্তে থাকতে পার।

নিশ্চিন্তেই ছিল অমরনাথ। দিনের বেলায়ও জেগে জেগে সুখস্বপ্ন দেখত। দেখত প্রেমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার দৃশ্য, ঘনিষ্ঠ হওয়ার দৃশ্য।

ছোট্ট ঘোড়ার পিঠে চেপে কাঠের পুলের কাছে এসেছে অমরনাথ। ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটছে। বরফ পুলের ওপর গিয়ে বেড়াবে খানিক। বড় ভালো লাগে এ জায়গাটা। পুব-পশ্চিম পাহাড়ের খাঁড়ি ভরাট

করে রেখেছে বরফপুল। যুক্ত করেছে দুটি পাহাড়কে। তলা দিয়ে লাদার নদী বয়ে চলেছে তর্জনগর্জন করতে করতে।

চলেছে অমরনাথ। সামনে এগিয়ে এসে, হাতে-গড়া পোড়া পোড়া রুটি দুখানা কিনতে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল প্রেমা। ধমকে উঠল অমরনাথ। চাইনে। প্রেমা তবু পিছু পিছু আসছে।' রুটি কিনতে পেড়াপীড়ি করছে বার বার!

বিরক্ত হয়ে উঠল অমরনাথ। মেজাজ চড়ল। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরোষে বলে উঠল, নে! যত সব ভিখিরীর দল! পকেটে পয়সার গন্ধ পেয়েছে। আর রক্ষে আছে।

গরীব হতে পারি। ভিখিরী নই। টাকার গন্ধে পিছু নিইনি। যেভাবে অমরনাথ টাকাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেইভাবেই অমরনাথের দিকেও টাকাটা ছুঁড়ে দিল মাটি থেকে কুড়িয়ে প্রেমা। পিছু ফিরল। ফোঁপাচ্ছে। আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছে। দু'চোখের জল ঝরছে গাল বেয়ে টস টস করে। ওড়নায় মুছে নিচ্ছে।

'ভিখিরী নই' কথাটা বড্ড বেশী বাজছে অমরনাথের কানে। অনুশোচনার তাড়নায় প্রেমার সামনে এসে উপস্থিত হল। ওড়নায় মুখ ঢাকল প্রেমা। চলে গেল সেখান থেকে তাড়াতাড়ি।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল অমরনাথও না বেড়িয়েই। বাড়িতে এসে অস্বস্তি বেড়েছে বই কমেনি। প্রেমার করুণ মুখখানাই মনে পড়েছে কেবল। থেকে থেকে ঘুম ভেঙেছে। প্রেমার কথাগুলো ব্যথার খোঁচা মেরেছে বুকের তলায়।

পরদিন গিয়েই ক্ষমা চেয়েছে। রুটি কিনেছে প্রেমার কাছ থেকে। পেট ভর্তি থাকা সত্ত্বেও ওকে তৃপ্তি দেবার জন্যই অমরনাথ পোড়া রুটির টুকরো চিবিয়েছে।

এই ভাবেই এগিয়ে এল অমরনাথ প্রেমার কাছে আর প্রেমা অমরনাথের কাছে। দুজনেই দুজনের হৃদয়ের কাছ বরাবর এসে পৌঁছে গেল। একজন যেন অন্যজনের প্রাণ। এক প্রাণ চলে গেলে, অন্যের প্রাণও বাঁচবে না আর। তাই কানের কাছে মুখ এনে, মৃদুস্বরে

শোনাত অমরনাথ প্রেমাকে।...ইয়া সমা জায়েংগে ইয়া মিট জায়েংগে। ...তোমার সঙ্গে মিলে যাবো, না হলে শেষ হয়ে যাবো।

প্রেমাও বলত ওকে।—জীবনে ছাড়ব না তোমাকে কখনো। প্রেমা ছাড়েনি অমরনাথকে।

মরে যায়নি অমরনাথও। মিলে আছে প্রেমার সঙ্গে। দুটি অন্তরের এ মিলন বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি বাবা। পারবে না-ও কখনো। বাবার যা করবার করেছে। একেবারে চরম করে ছেড়েছে।

দিল্লীতে ব্যবসাবাণিজ্য শেখানোর অজুহাত দেখিয়ে আটকে রাখার সুযোগ নিয়েছে বাবা পুরোদস্তুর প্রেমার ওপর। অন্য পাত্রের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিতে চেয়েছিল ওর। বলেছিল, সত্যি যদি তার ছেলেকে ও ভালোবেসে থাকে তাহলে সরে দাঁড়ানো উচিত। অমর-নাথের মানসম্ভ্রম রাখা উচিত। তাকে বাঁচানো উচিত।

খানিক চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিল বাবাকে প্রেমা। উচিত কাজই করবে সে। বরফ পড়া রাতে বেরিয়ে পড়েছিল ঘর থেকে সবার অজান্তেই। বেশীদূর এগুতে হয়নি তাকে আর। বাঙলোর সামনেই রেখে গেছিল তার গোলাপ পাপড়ি দেহটাকে। পরের দিন সকালে বরফ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করার সময় বরফের তলা থেকেই প্রেমার মৃতদেহটাকে পাওয়া গেছিল। মুখের আদলে চিনতে পারা গেছিল ওকে। রঙটাই বদলে ছিল শুধু। গোলাপীর জায়গায় বরফ-সাদা।

দিল্লী থেকে ফিরে এসে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে সব শুনেছিল অমরনাথ। বিশ্বাস করতে পারেনি প্রেমা নেই। বলেছিল, সে না থাকলে আমি থাকতুম না। আমি যখন আছি' সে আছে। কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই। বড় অভিমান তার। প্রথম দিনেই বুঝেছিলুম আমি ওকে।

অস্থির পায়ে বেরিয়ে গেছে অমরনাথ বাড়ি থেকে। এসেছে প্রেমাদের বাঙলোয়। নীচের ঘরখানা—যে ঘরে থাকত প্রেমা—তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। বুকভাঙা নিশ্বাস ঝরে পড়েছে। কাশ্মীরের

অস্থিসন্ধি পর্যন্ত খুঁজেছে পাগলের মতো। তারপর কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে অমরনাথের একদম। কিন্তু বন্ধ হয়নি তার প্রেমার ঘর অনুসন্ধান করা।

এসেছে রোজ প্রেমাদের বাঙলোয়। থেকেছে কিছুক্ষণ। ফিরে গেছে শেষে। আবার এসেছে পরদিন। এইভাবেই গাই হাসপাতালে যাবার আগে অবধি চলছিল তার প্রেমাদের বাঙলোর আঙিনায় আনাগোনা। বিরতি ছিল শুধু হাসপাতালে থাকার সময়।

ফিরে আসতে আগের অভ্যাসই পেয়ে বসতে লাগল আবার তাকে। বাড়ি থেকে বেরুবার জন্য ছটফট করত দিনরাত। অসুস্থ হয়ে পড়ত। প্রথমটায় আটকে ছিল বাবা ছেলেকে কিছুদিন। তারপর ছেড়েছিল হুজন বিশ্বস্ত অনুচরকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে। তারও পরে অনুচরদের পাঠানো প্রয়োজন বোধ করেনি আর বাবা। বুঝেছিল, ছেলের যাওয়া-আসার একটা গণ্ডী আছে। এ গণ্ডীর বাইরে সে একপা বাড়াচ্ছে না। বাড়াবেও না। বাড়ি থেকে প্রেমাদের বাঙলো আর প্রেমাদের বাঙলো থেকে বাড়ি—এ সীমারেখার বাইরে বেরুবে না ও মোটে। নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে অমরনাথকে ছেড়ে দিত বাবা বাইরে একলা বেরুতে।

আসত অমরনাথ রোজ ভোরে প্রেমাদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাঙলোর আঙিনায়—বাঙলোয়।...

রতনলালের মুখে শুনেছিলুম আমি অমরনাথের সমস্ত কথা। অদ্ভুত ভাবেই এঁকে ফেলেছিল রতনলাল প্রেমার ছবি। ছবির দৌলতেই অভাবী কল্কার কারিগর আজ সম্পত্তির মালিক। সারাজীবনের আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে অমরনাথের বাবা। ছবি পাবার পর অমরনাথ সুস্থ হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ! স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আগের মতো। মুখে হাসি ফুটেছে। মুখে কথা ফুটেছে।

প্রেমার ছবি দেখাতে নিয়ে এসেছিল আমায় রতনলাল অমরনাথের বাড়িতে।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম আমি। ইতস্তত করেছিলুম। সামনের খাটের বিছানায় বসে আছে বালিশে ঠেসান দিয়ে, একা একটি সুন্দরী তরুণী। অবাক চোখে দেখেছি আমি. বসে আছে প্রেমা। চোখে মুখে চাপা কৌতুকের হাসি। ফ্রেমে-আঁটা প্রেমা যেন আমাদের মতো এই মাটিরই মানুষ। ছবি নয়।

আচমকা একটা ধাক্কা খেল বুকে যশমতীবাঈ। ধাক্কাটা শুধু একার লাগেনি তাঁর, লেগেছিল পুত্রবধূ চন্দনাবাঈ-এর বুকেও সজোরে। শ্বাশুড়ী-বৌ চোখ খুলেছিলেন দুজনে একই সঙ্গে। দুজনেরই সর্ব-শরীরে একটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপুনি ধরেছিল প্রথমে। চন্দনাবাঈ-এর কোলের কাছে বসন্ত নেই।

মাঝখানের আগুনটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে তখনো। আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে জ্ঞাতি-স্বজনরা। কারো মুখে কোনো কথা নেই। চোখ বুজে বসে আছে সকলে। অতবড় ঘরখানা একেবারে নিস্তব্ধ-নিঝুম।

এ সময় কথা কওয়া বারণ। জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে এমন কি ওঠাউঠি করতেও নিষেধ। সকলের মন অতীতে ফিরে যায়। যাঁরা বংশের মান-মর্যাদা রেখে গেছেন এক সময়—যাঁরা বীর-যোদ্ধার খ্যাতি পেয়েছেন মরণের বুকে ঝাঁপ দিয়ে—তাঁদের আত্মার সঙ্গে যেন একাত্মা হয়ে যায় আপনজনেরা এই বীর-উৎসবের দিনটিতে। মারাঠী যোদ্ধাবংশীয়দের এই দোলপূর্ণিমার দিনের বীর-উৎসবটি অতি পবিত্র।

আগুনের তাপে তাপে মানুষের মনের গ্লানি গলে বেরিয়ে আসে চোখের জলে। রাগ-দুঃখ হিংসা-দ্বেষ ধুয়ে ভেসে যায় সেই জলে। পুরনো শত্রুতা ভুলে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে দ্বিধাহীন নিঃশঙ্কচিত্তে মেলামেশা করে।

মেলামেশা করেন যশমতীবাঈ আর চন্দনাবাঈও। মহাশত্রু জেনেও, এই দিনটিতে তাদের সঙ্গে হাসেন, প্রাণ খুলে কথা কন। বিষয়ী লোকের আত্মরক্ষার কপট আচরণের পোশাক খুলে ফেলে দেন একেবারে। আন্তরিকতার আবেদন আলাদা। দূরের মানুষকে কাছে টেনে আনে। একদম হৃদয়ের কাছ বরাবর।

শাশুড়ী-বৌ-এর আন্তরিক আচার-ব্যবহারে, আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ

হয় সকলে প্রতিবছরেই। এবারেও হয়েছে—ওঁদের তাই দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু—'কিন্তু' কথাটা ওঁদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ঘুরপাক খাচ্ছে আজ ঘন ঘন। বিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরছে। সন্দেহের দানা বাঁধছে ভিতরে।

যশমতীবাঈ-এর সন্দিগ্ধ তু'চোখ সবার মুখের ওপর দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এলো। যাদের একটু আগে মনে হয়েছিল খুব ভালো, তাদের ওপর অবিশ্বাস আসছে। অবিশ্বাস আসছে নিজের অন্য অন্য ছেলে-বৌদের ওপরই বেশী করে। এটা অন্যায় নয়! অবিশ্বাস করার কারণও যথেষ্ট রয়েছে। সে সব জানেন যশমতীবাঈ ভালোরকমই। চন্দনাবাঈ-এরও অজানা নেই কিছু।

একটু আগে শুদ্ধমনে শাশুড়ী-বৌ বসন্তর হাত ধরাধরি করে বিশুদ্ধ আগুন বেষ্টন করেছিলেন। সকলের নাচের তালে তালে নিজেদের পা ফেলেছিলেন। সবায় গলায় গলা মিলিয়ে বীরগাথা গেয়েছেনও নিজেরা। তারপর বসন্তকে নিয়ে বসেছেন অন্যদের সঙ্গে শাশুড়ী-বৌ।

নিজের স্বামীর - জয়বন্তর চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে গেছেন যশমতীবাঈ। চন্দনাবাঈও বিভোর হয়ে গেছেন শ্বশুরের মুখখানা মনে পড়তে। পাঁচ বছর আগে হারিয়েছেন তিনি শ্বশুরকে। শ্বশুরের স্মৃতি ভুলতে পারেননি! ভুলতে পারবেন নাও জীবনে।

শ্বশুরের স্নেহের দৌলতে এ-বাড়িতে বৌ-এর জায়গায় মেয়ের স্থান অধিকার করে বসেছেন তিনি আজ। অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্বাশুড়ীও মদত যুগিয়েছেন। চারটেই ছেলে। মেয়ের বড় সাধ ছিল, চন্দনাবাঈ আসতে পূরণ হল।

চন্দনাবাঈও নিজের বাপ-মার মতো দেখতেন ওঁদের। তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন ওঁরা। দেওরদের অন্য জায়েদের এই কারণেই ঈর্ষার কারণ—চক্ষুশূল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। মায়ের স্বভাবটা পুরো পেয়েছিলেন। তাই রক্ষে। সব বিষয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করতেন। পারতেনও। অনায়াসে তুঃখ-ক্ষোভ মান-অপমান মন থেকে ঝেড়ে-মুছে বার করে দিতে পারতেন মুহূর্তে।

এই উদাহরণ অন্য জায়েদের সামনে খাড়া করতেন শ্বশুর বার বার।

উদাহরণ নেওয়া দূরের কথা, গাত্রদাহই বৃদ্ধি হত বরং ওদের এতে। কাল-বিলম্ব না করে স্বস্থানে প্রস্থান করত ওরা তক্ষুনি। অবাধ্য বৌদের ব্যবহারে অশান্ত হয়ে উঠতেন শ্বশুর! মুখচোখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠত স্পষ্ট।

চন্দনাবাঈকে কাছে ডাকতেন। ভাবতেন, চন্দনাবাঈ জায়েদের ব্যাপার দেখে দুঃখ পেয়েছেন বুঝি। মন ঘোরাবার জন্য মাথায় হাত দিয়ে ইশারায় বুলোতে বলতেন। যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।

কোনো অসুখ-বিসুখ করলে একমাত্র চন্দনাবাঈ ছাড়া অন্য ছেলের বৌদের মধ্যে কাউকেই ধারেকাছে ঘেঁষতে দিতেন না মোটে শ্বশুর। বাড়িময় জাহির করে বেড়াতেন—বড়বৌমার মতো ওরকম মমতা নেই এ-বাড়ির কারো ভিতর। কি প্রাণঢালা সেবা। রোগ রুগীর কাছ থেকে হাজার হাত দূরে পালিয়ে যায় ওকে দেখলে। ওর স্নেহের স্পর্শে সমস্ত যন্ত্রণা যে কেমন করে সেরে যায় সে-কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। এ-বাড়ির কেউ দেখতে পারে না ওকে। কারণ ওর মতো পরিষ্কার মন আর ওর মতো গুণ নেই বলে তাদের। সব বুঝে-সুঝেও তাদেরই রোগ-ব্যামোতে বড়বৌমা কিন্তু নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে সেবা করে।

এতে যে ,শ্বশুরের নিজের মনে কি অনুভূতি জেগে উঠত— উনি সেকথা বার বার শোনাতেও ছাড়তেন না সবাইকে। উনি বলতেন চন্দনাবাঈকেও ডেকে ডেকে—দুসরা-ইয়াঁচি সেওয়া করত আসতা-না···। তোমার সেবা আমায় সদাসর্বদা ঘিরে রেখেছে। অপরের সেবা করতে দেখলেও মনে হয় যেন আমারি করছো।

এই কথা বলতে বলতেই চন্দনাবাঈ-এর চোখে চোখ রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন শ্বশুর একদিন। শ্বশুরের শেষের মৃত্যুস্বরের কথা কানে বাজে এখনো। এখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন শুনতে পান তিনি।

ঘুম ভাঙলে সামনের দেওয়ালের দিকেই দু'চোখ আটকে যায়। শ্বশুরের ছবির মুখখানা যেন হাসি হাসি দেখায়। অজান্তে দৃষ্টি ঘুরে

যায় পাশের ছোট্ট খাটটায়। ঘুমন্ত বসন্তর মুখখানাও মৃত্থ মৃত্থ হাসছে। হাসির সঙ্গে অনেকটা মিল। মুখের আদলটা তো প্রায় একই ধরনের। বসন্তর মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলের টুকরোগুলো কপাল থেকে আলতোভাবে সরিয়ে দিতে থাকেন।

বিচিত্র জীবন এই শিশুর। চার বছর বয়েস সবে। কত আরাধনার কত আদরের, কিন্তু সকলের স্নেহ-আদর থেকে বঞ্চিত তবুও। এইটুকু ত্বধের বালকের কি এমন অপরাধ থাকতে পারে, যার জন্য সবার অসহ্য ও—সবার ত্ব'চক্ষের বিষ ?

ভেবে-খুঁজে কোনো সূত্র বার করতে পারেননি চন্দনাবাঈ। তবে একটা কারণ খোঁচা দেয় ভিতরে কেবল। বিষয়। সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী করে গেছেন শ্বশুর বসন্তকে। এটা বসন্তের দোষ নয়। যখন শ্বশুর শয্যাগত অবস্থায় উইল করেন, তখন .বসন্ত মাটির বুকে নামেনি। নেমেছে শ্বশুর চলে যাবার বছরখানেক পর। তবু বাচ্চাটার ওপর নিজের বাবারও ঈর্ষা! কাকা-কাকিরা তো ওর মরণ কামনা করছে দিনরাত। স্বকর্ণে শুনেছে চন্দনাবাঈ। তুকানে হাতচাপা দিয়ে সেখান থেকে সরে গেছেন তক্ষুনি। ইষ্টদেবী ভবানী-কে মনে মনে স্মরণ করেছেন।—নির্দোষ শিশুকে তুমি ছাড়া বাঁচাবার আর কেউ নেই মা। তোমার কোলেই রেখে দিয়েছি ওকে।

সময় সময় শিউরে ওঠেন চন্দনাবাঈ ঘরের লোকের আর দেওর-জায়েদের চাউনি দেখে। ছেলেটাকে তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে একা পেলেই ওরা যেন ত্বচোখ গিয়ে গিলতে আসে তেড়ে। আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছেন। দৌড়ে কাছে দিয়ে বুকে চেপে ধরেছেন বসন্তকে। সরল শিশুর নির্ভীক ত্ব-চোখ মায়ের রকম-সকমে হেসে ফেলেছে। হাসেনি চন্দনাবাঈ। ছেলে বুকে নিয়ে একছুটে ঘরে চলে এসেছেন। ত্রাস—একটা অজ্ঞাত ত্রাস ঘিরে ধরেছে তাঁকে। ওদের দৃষ্টি থেকে ভিতরের দানবগুলোকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন পরিষ্কার।

কেন এ দানব-প্রবৃত্তি জাগবে ওদের বাচ্চাটাকে দেখলে ?

নিজেদেরই বুদ্ধির দোষে—যে যে-ঘরে আছে - সেটুকুর জীবনস্বত্ব-ভোগ ছাড়া কোনো অধিকারই পেল না ওরা এ বাড়িতে। বেঁচে থাকতে শ্বশুরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করেছে সকলে। একদিনের জন্য তাঁকে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে-খেতে দেয়নি কেউ। গায়ে হাত তুলতেও কসুর করেনি ছেলেরা বিষয় লিখিয়ে নেবার জন্য।

উত্যক্ত হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থাতেই দেশত্যাগী হতে হয়েছিল শ্বশুরকে। সঙ্গে সঙ্গী করেছিলেন স্রেফ দুজনকে যশমতীবাঈ আর চন্দনাবাঈকে। জন্মস্থান ইন্দ্রাওয়াতীগাঁও ছেড়ে পুণায় জ্ঞাতিভায়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন।

ছেলেদের নামে বিষয় ভাগ করার আগের উইলখানা ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেলে দিয়েছেন। নতুন বয়ানে উচ্ছৃঙ্খল বিষয় চালাবার অযোগ্য ছেলেদের চিত্র তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় পুরুষকে অর্থাৎ ছেলেদের দিলে বিষয় থাকবে না। তাই বংশের তৃতীয় পুরুষ যে আসবে—সেই সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে শুধু। এতে এক পুরুষ ডিঙিয়ে কিছু পরমায়ু পাবে তবু বিষয়টা। যে ছেলে অধিকারী হবে—সে বড়বৌমার ছেলে। যদি বড়বৌমার ছেলে একান্ত না-ই হয়, তাহলে বড়বৌমাই সমস্তর উত্তরাধিকারিণী হবে।

শুনে মাথায়,বাজ পড়েছিল যেন চন্দনাবাঈ-এর। শ্বশুরের দু'পা জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভিজিয়েছিলেন। পুরোনো উইলই বজায় রাখতে বলেছিলেন। চন্দনাবাঈ-এর মাথায় শীর্ণ হাত রেখে, ক্ষীণকণ্ঠে স্তোকবাক্য দিয়েছিলেন শ্বশুর। বেশ তো—ওদের চরিত্র-মন বদলাক না ওরা—উইল বদলাতে আর কতক্ষণ।

শ্বশুর বেঁচে থাকতে ছেলেদের মন-চরিত্র বদলায়নি একটুও। শ্বশুরেরও উইল পাল্‌টানো সম্ভব হয়নি বুঝি তাই।

উনি মারা যাবার মাস তিন-চার পর বিষয়ী ব্যাপার নিয়ে স্বামীর সঙ্গেও মনান্তর ঘটেছিল চন্দনাবাঈ-এর। এর আগেই দেওর জায়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেছল। অবিশ্যি এটা চন্দনাবাঈ-এর পক্ষ থেকে হয়নি। হয়েছিল অন্য দিক থেকেই।

ছেলে হবার পরও চন্দনাবাঈ সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছিলেন। বসন্ত বড় হয়ে, সাবালক হলে, ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যার যা বিষয় ফেরত দেওয়াবেন চন্দনাবাঈ নিশ্চয়ই। তাঁর প্রতিশ্রুতি মেনে নেয়নি কেউ। বিশ্বাস করেনি তাঁকে ওরা।

ছেলের ওপর প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠেছিল ওদের। ছেলেটাই যেন ওদের বিষয় থেকে হটাবার মূল। যত আক্রোশ ওরই ওপর। শ্বশুরের মনের গলা টেপা ছাড়া এমনি গলা টিপে মারতে পারেনি ওরা। সেই আপসোস যায়নি বুঝি ওদের আজো। তাই ছেলেটাকে শেষ করে শ্বশুরের ওপরে প্রতিশোধ নিতে চায় হয়তো।

এর প্রমাণ পেয়েছেন চন্দনাবাঈ। ভাবলে সর্বশরীর শিউরে ওঠে। ছোটকাকী আদর করে কাছে ডেকে লাড্ডু দিয়েছিল বসন্তকে। বরাত জোর বসন্ত মুখে পোরেনি। আনন্দে নাচতে নাচতে মাকে দেখাতে এসেছিল। প্রথমটায় চন্দনাবাঈ-এর আনন্দই হয়েছিল ছেলের আনন্দ দেখে। ভেবেছিলেন বাড়ির লোকের মন ঘুরতে শুরু করেছে। ছেলেটার ওপর মায়ামমতা পড়ছে বুঝি ধীরে ধীরে। নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি বহুদিন বাদে।

কিন্তু নিশ্বাস ফেলেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। শ্বশুরের ছবির দিকে নজর পড়ল আগোচরেই। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কে যেন বলতে লাগল হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লাড্ডু দুটো ফেলে দে বাইরে শীগগির। খেতে দিসনে বসন্তকে।

কেমন যেন হয়ে গেছলেন চন্দনাবাঈ। অকারণ সন্দেহের বিষয় চিন্তা করতেও ভুলে গেছলেন মুহূর্তে। যা কিছু করেছিলেন, সম্মোহিত মানুষের মতো করেছিলেন। ছেলের তারস্বরে চীৎকার কান্না গ্রাহ্য না করে, জোর করে দুহাত থেকে লাড্ডু দুটো কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন রাস্তায়।

ছোট জায়ের যে এতখানি দুরভিসন্ধি ছিল ছেলে মারবার—ধারণা-কল্পনার বাইরে ছিল তাঁর। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত চোখে দেখেছিলেন, আঁস্তাকুড়ের কুকুরটা লাড্ডুর গুঁড়োগুলো জিব দিয়ে

চেটে খেতে খেতে টলে পড়ল। মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ল তক্ষুনি। দুপাশ বেয়ে লালা ঝরছে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখনো অভিমানে ঠোঁট ফোলাচ্ছে বসন্ত। চন্দনাবাঈ ছুটে কাছে এসেছিলেন। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, চুম খেতে খেতে হাপুস নয়নে কেঁদেছিলেন।

এর পর থেকে শাশুড়ী-বৌ চোখের আড়াল মনের আড়াল করতেন না কখনো বসন্তকে। ওঁদের সতর্ক দৃষ্টির পাহারার ভিতর থাকত বসন্ত সদাসর্বদা। দোল-পূর্ণিমার দিনে বীর-উৎসবের সময় মায়ের কাছে বসবার জন্য বায়না ধরে বসন্ত। কেঁদে-কেটে বাড়ি মাত করে। উৎসব পণ্ড হবার উপক্রম দেখে, ছেলেকে বসাতে বাধ্য হন মা। এই পর্ব চলছে আজ বছর তিনেক ধরে। এবার নিয়ে তিনবারে পড়েছে।

এবারের মতো আগের দুবারে এ রকম হয়নি। বসন্ত কাছে নেই। একা উঠে যাবার ছেলে নয় ও। এ সময়টায় ওঠবার কোন ক্ষমতাই থাকে না ওর। ও ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে একেবারে। শ্বশুরের চিন্তা যত গভীর হতে থাকে চন্দনাবাঈ-এর, ছেলেটারও দুচোখের পাতায় যেন তত ভারী ঘুম নেমে আসতে থাকে। এটা লক্ষ্য করেছেন যশমতীবাঈ। বৌমাকেও জানিয়েছেন।

শাশুড়ীর কথা সত্যি। চন্দনাবাঈ আগেও জানতে পেরেছিলেন এ ব্যাপারটা। অবিশ্যি প্রকাশ করেননি শাশুড়ীর কাছেও তখন। যখুনি দুষ্টুমি থেকে থামাতে পারেননি বসন্তকে, তখুনি কেমন করে যেন শ্বশুরের চিন্তা এসে গেছে ভিতরে। আর সেই সঙ্গে শ্বশুরের কথাগুলো বার বার কানে বেজে উঠেছে—দুসর-ইয়াঁচি সেওয়া করত আসতানা···। অপরের সেবা করতে দেখলেও মনে হয় যে আমার করছো।

বসন্তর মাথায় হাত বুলোবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যভাবে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমন্ত ছেলে এ পবিত্র আগুনের সামনে থেকে উঠতে পারে না কিছুতেই। শাশুড়ী-বৌ-এর তন্ময়তার সুযোগে কেউ না কেউ—

শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন চন্দনাবাঈ। আদেশের অপেক্ষা। এখুনি না উঠলে এখুনি না খুঁজলে—একটা কিছু অশুভ ব্যাপার ঘটে যেতে খুব বেশী দেরী লাগবে না। চন্দনাবাঈ-এর ছু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভিতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছেন।

যশমতীবাঈ বৌ-এর চোখের প্রশ্ন বুঝেছেন। চন্দনাবাঈ-এর মতো তাঁরও মনের অবস্থা মাঝপথে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর আদেশ ছাড়া বীর উৎসবের চক্র ভাঙা অসম্ভব।

চক্র ভাঙলেন যশমতীবাঈ নিজেই।

উঠে দাঁড়ালেন। সরোষে বলে উঠলেন, ভণ্ডামি করে চোখ বুজে আর কাউকে এক মুহূর্ত বসতে দেওয়া হবে না এখানে। সকলের ছলচাতুরী বেশ বুঝতে পারা গেছে। পবিত্র দিনের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অবিশ্বাসীরা। বসন্তকে সরিয়েছে।

ইন্দ্রাওয়াতী গাঁয়ের অন্ধিসন্ধি অবধি খোঁজবার জন্য লোক পাঠালেন যশমতীবাঈ। তোলপাড় করে ফেললেন চতুর্দিক। বসন্তকে পাওয়া গেল না।

বাড়িময় একটা শোকের ছায়া ঘোরাফেরা করতে লাগল যেন শ্বাশুড়ী-বৌ-এর চোখে। বসন্তর নিখোঁজে নতুন করে স্বামী-হারানোর শোকে ভেঙে পড়েছেন যশমতীবাঈ আবার। চন্দনাবাঈ-এর নিদারুণ বেদনায় ভিতরটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে।

এইভাবে কেটে গেল ওঁদের তিন দিন তিন রাত। চোখের জলে ছুজনের বুক ভেসেছে শুধু। ভবানীর দোরে মাথা কোটা সার হয়েছে। যেটুকু বা ক্ষীণ আশা ছিল—বসন্তকে ফিরে পাবার কোনো-না-কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে হয়তো—সেটুকুও মন থেকে মুছে যেতে বসেছে। তার জায়গায় বসন্তর নিশ্চিত জীবন সংশয়ের ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। অলক্ষুণে চিন্তাটাকে ঠেলেঠুলে ভিতর থেকে বার করবার চেষ্টা করছেন ওঁরা। পারছেন না। তবুও চেষ্টা চলছে।

যশমতীবাঈ হতাশায় ভেঙে পড়লেও মুখে সাহস দিয়ে যাচ্ছেন

বৌকে অনবরত। ভেঙে পড়লে চলবে না। বসন্ত বেঁচে আছে। ওকে ফিরে পাওয়া যাবেই। সদা-সর্বদা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করে যেতে হবে এই কটা কথা। আজে-বাজে চিন্তাভাবনা করা চলবে না এ সময় একদম।

কাজ হল। শাশুড়ীর অভয়বাণীতে যেন দৈববাণীই স্বকর্ণে শুনলেন চন্দনাবাঈ। নির্দেশ পালন করে চললেন নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে অহর্নিশি।

চতুর্থ রাতের শেষ প্রহর।

সমস্ত রাড়িটা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। জেগে আছে কেবল শাশুড়ী-বৌ দুজনে।

যশমতীবাঈ পায়চারি করছেন ঘরের এ মোড় থেকে ও মোড় অবধি। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দনাবাঈ চুপচাপ। পুব দিকে দৃষ্টি আটকে পড়ছে কেবল। দূরে—অনেক দূরে আগুনের নীল শিখা একটা কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। চোখের ভুল মনের ভুল না রাত জাগার ফসল এটা—কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না চন্দনাবাঈ। বার বার দেখছেন একই জিনিস একই দিকে। চোখ ঘোরালেও আবার দেখতে ইচ্ছে করছে। নীল শিখার মোহ পেয়ে বসছে তাঁকে। মন টানছে দেহ টানছে।

শাশুড়ীকে, দেখালেন, মনের ভাব জানালেন চন্দনাবাঈ। বৌ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন তিনি। বৌ-এরই দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন—সত্যিই নীল শিখা। তাঁরও মনে হতে লাগল শিখাটা যেন ডাকছে তাঁকেও।

আকাশ ভরা জ্যোৎস্না এখন মাটির বুকও ভরে দিচ্ছে। চারদিকে আলো আর আলো। এত আলোর ভিতরও পুবদিকের নীল শিখাটা বড্ড যেন জোরাল দেখাচ্ছে। শিখাটার তীব্র আকর্ষণ বেশ অনুভব করছেন শাশুড়ী-বৌ দুজনেই এক সঙ্গে। নিজেদের অজ্ঞাতসারে কখন যে ওঁরা ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন সে সব খেয়াল নেই। পথ ভেঙে ভেঙে আচ্ছন্নের মতো নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছতেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল যেন চোখের সামনে থেকে নীল শিখাটা।

সামনের কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে মা-ঠাকুমা ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলেন দুজনে। বসন্তর কণ্ঠস্বর।

ফিরে এলো ওঁদের কাছে বসন্ত আবার।

রামদাস চাষী তার নিজের কুঁড়ে ঘরেই লুকিয়ে রেখেছিল বসন্তকে সযত্নে। কত লোক তার কুঁড়ে ঘরের আশপাশ খোঁজাখুঁজি করে গেছে। হদিস পায়নি বসন্তর। আশ্চর্য, এক-আধবার চেয়ে দেখেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ত ও। বসন্তর পরিচয় পাওয়া মুশকিল হয়েছিল রামদাস চাষীর কাছে।

ছেলেটা ঘুমিয়ে থাকত বলেই রক্ষে। না হলে ডাকাডাকি চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি করলেই, লোক জানাজানি হয়ে যেত, এতে কি যে হতে পারত—ভাবতেও সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। রামদাস চাষী যে সব-কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। সে দেখেছে, একদল লোককে ছুটে চলে যেতে এখান দিয়ে। পাশের মজা কুয়োর ভিতর ঘুমন্ত বসন্তকে ফেলে দিল একজন। এটাও স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে ঝোপের আড়াল থেকে।

ওরা চলে যেতে, ভয়ে ভয়ে কুয়োর কাছে এসে উঁকি মেরে দেখেছে। ছেলেটা বসে আছে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ভিতরে। ভাগ্যিস জল ছিল না। থাকলে আর ফিরে পাওয়া যেত না বসন্তকে কোনোদিন। কুয়ো থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল রামদাস চাষী ওকে।

যে ফেলেছিল, তাকেও আসতে দেখেছে আবার। কুয়োর ভিতর উঁকি মেরে খুঁজে বার করতে কিংবা তাদের আশা পূরণ হয়েছে কিনা সেই খবরটা জেনে নিঃসন্দেহ হতে এসেছিল হয়তো।

পরেও এসেছে অনেকে এখানে। তাকে জিজ্ঞেসও করেছে এরকম ছেলে দেখার কথা। ঘাড় নেড়ে 'না' উত্তর দিয়ে সরে গেছে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি। দুরু দুরু করে উঠেছে বুক। মুখ ফসকে কিছু বেরিয়ে পড়লে বিপদ হতে পারে। ছেলেটার কে হিতাকাঙ্ক্ষী কে অহিতাকাঙ্ক্ষী রামদাস চাষী বুঝবে কেমন করে?

প্রথমে অবিশ্বাসের দোলা লাগলেও, ছেলেটার হিতাকাঙ্ক্ষী

আপনজনদের বুঝতে বেশী দেরী হয়নি। বসন্ত নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছিল রামদাস চাষীকে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই মা-ঠাকুমা বলে চিৎকার করে উঠেছিল। ঘুম ভেঙে বাইরে বেরুবার জন্য কি ধ্বস্তাধ্বস্তি তার সঙ্গে। ওইটুকু ছেলের অত জোর এলো গায়ে কোত্থেকে—ভাবতেও বিস্ময় লাগে। দরজা খুলতে বাধ্য করেছিল ছেলেটা রামদাস চাষীকে। বাইরে এসে প্রথমে মায়ের বুকে, তারপর মায়ের বুক থেকে ঠাকুমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সবুজ পাহাড়ের কোলে কালো মাটির ঢিবির ওপর বসে বসে শুনছিলুম আমি মৃত্যুজয়ী বসন্তর অদ্ভুত জীবন-কথা। সামনের ঢিবিটায় পা ঝুলিয়ে বসে বলছিলেন মাধবজী। এতক্ষণ যেন উনি এক স্বপ্নলোকে চলে গেছলেন। দুজনের দিকে দুজনে চেয়ে আছি। মৃত্যুজয়ীকে দেখার সাধ কার না হয়? আমারও হয়েছিল। প্রবল বাসনাটা হয়তো মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল আমার।

বুঝেছিলুম, মানুষের মুখ-চোখের ভাষা জানবার ক্ষমতা বেশ আয়ত্তের মধ্যে মাধবজীর। নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে বসন্তর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন তিনি। হাসতে হাসতেই বললেন, এই মাধবজীরই মা-ঠাকুমার দেওয়া ডাক-নাম বসন্ত।

ঘটনাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি।

সব শুনেছিল, সব জানত বলবীর সিং আগে থেকেই। তবু কেন যে কারো কথা মেনে নেয়নি, প্রত্যক্ষদর্শীদের কোন বিবরণ বিশ্বাস করতে পারেনি কেন—তা নিজেও বোধহয় ভেবে দেখেনি একটিবারও। দেখলে, একটা নিদারুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হত না কখনো। হয়তো রক্ত জল করা ভয়ংকরের হাতছানির কবলে গিয়ে পড়তে হত না।

পড়তে হল বলবীর সিং-এর নিজেরই গোঁয়ার্তুমির জন্য। কিন্তু তখন নিরুপায়। বিভীষিকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে আটকে পড়েছিল সে। বেরুবার পথ খুঁজে পায়নি কোন দিক দিয়েই। বেরুতে চেষ্টা করেছে, পালাতে চেষ্টা করেছে, মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছে। পারেনি। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তার। বাঁচবার জন্য প্রাণপণে যুঝেছে কত না। এক পা পিছু হটতে গিয়ে, মৃত্যু গহ্বরের দিকেই এগিয়ে গেছে আরো দশ পা।

নিয়তির আকর্ষণের মতো একটা অশুভ আকর্ষণ যে ধীরে ধীরে খেলিয়ে নিয়ে আসছিল নিজের খপ্পরে ফেলবার জন্য—প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি মোটে। ভয়ত্রাস মনের কোণে উঁকি মারেনি একবারও। আঠারো বছরের বলিষ্ঠ তরুণ বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলছে। দেহের প্রত্যেক স্নায়ু সম্পূর্ণ সবল সতেজ তখন। সুদর্শন হাসিখুশি মানুষটা সঙ্গীদের সঙ্গে হাসিমস্করা করতে করতে চলছে পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে—চড়াইয়ে উঠে উতরাইয়ে নেমে। সময় সময় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ ফুটে উঠছে সারা মুখখানায়।

গভীর খাদের ধার দিয়ে নির্ভীক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আবার কখনো বন্ধুদের হাত ধরে টানাটানি করছে তাকে অনুসরণ

করে চলতে। খাদের দিকে তাকিয়ে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে বন্ধুরা। একটু উনিশ-বিশ হলে, পা ফসকে গেলে রক্ষে নেই আর। কোন্ অতল তলে যে তলিয়ে যাবে তার হদিস পাবে না তার জীবনে কেউ। বন্ধুদের অনেকে বলবীরের কাছ থেকে ছুটে পালায় দূরে—অনেক দূরে।

হো হো করে হেসে ওঠে বলবীর সিং। কেঁপে ওঠে ওর দীর্ঘ দেহ। কেঁপে ওঠে পাহাড়-বন। কাঁপন ধরে কাছের বন্ধুদের বুকের তলায় তলায়। হাসিটা ভালো লাগছে না একদম। বিচ্ছিরি রকমের। হাসি দেখে মানুষের হাসি পায় কিন্তু এ হাসিতে যেন একটা কান্নার সুর বেজে উঠছে তাদের কানে।

পথের ভয় মনের ভয় ঘোচাবার জন্য যে হঠকারিতা করছে সে, যে আত্মম্ভরিতা দেখাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, মানুষটা বুঝি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। আরো হয়ে উঠেছে তার আচার-ব্যবহারে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, একটা উন্মত্ত ভাব পেয়ে বসেছে ওকে। এই উন্মত্ততাই তাদের ভয় সরাতে ভয় ধরাচ্ছে বেশী করে। গুরুজনদের আদেশ নির্দেশ অগ্রাহ্য করছে। যে রাস্তায় পা বাড়াতে নিষেধ, জঙ্গল খাদের যে দিক দিয়ে যেতে একেবারে বারণ—ইচ্ছে করেই ও সেই রাস্তায় সে দিক দিয়েই যাচ্ছে। এ জিদের ফলাফল ভালো হবে না। হতে পারে না জানা কথাই। তবুও অবাঞ্ছিত অলক্ষণকে ডেকে আনবার জন্য ও যেন খুব তৎপর হয়ে উঠেছে।

অদৃশ্যলোকের এক অজানা দুর্দান্তমন দারুণ প্রভাব বিস্তার করছে বুঝি বলবীর সিং-এর মনের ওপর। কেমন ঠেকছে ওকে। পরিচিতদের কাছে ও অপরিচিত। অন্য দুনিয়ার অন্য মানুষ। বন্ধুদের চোখে ক্রমে মূর্তিমান ত্রাস হয়ে উঠতে লাগল বলবীর সিং।

যে ক'জন কাছে ছিল, তাদের অভয় দিতে গিয়ে, অতি দুঃসাহসী ভাব দেখাতে গিয়ে কাল হল বলবীর সিং-এর। নানা অজুহাত দেখিয়ে এক এক করে সরে গেল তারা। অন্য পথ ধরল। পিতৃদত্ত জীবনটা তারা বেঘোরে খোয়াতে পারবে না।

সকলকে চলে যেতে দেখে বলবীর সিং ফেটে পড়ল রাগে। ফর্সা লোকের মুখখানা দিয়ে রক্ত ফেটে বেরোয় আর কি। বিকৃত স্বরে চিৎকার করে বলে উঠল—যে ভয়ের জন্য তোরা সব পালাচ্ছিস, সেই ভয়ই ধরবে তোদের দেখিস! বুকে হাত চাপড়েছিল।—এ বান্দা তোদের আগেই গাঁয়ে ফিরে যাবে বহাল তবিয়তে। যত সব ডরপোক—ভীতুর দল!

ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে চলার মোড় ঘুরিয়ে দিল বলবীর সিং। আগেকার চেয়ে দ্বিগুণগতিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল। যারা ছেড়েছে ওকে তাদের যেন হাড়-পাঁজরা মাড়িয়ে দলে-পিষে দিয়ে চলতে লাগল।

মনে উদ্ধত ভাবটা পেয়ে বসলে দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে না। ঘোলাটে ধোঁয়াটে হয়ে যায়। বিভ্রান্তির মোহে আচ্ছন্ন মনে তখন ভুল দেখা ভুল পথে চলা ভুল বোঝা সবই ঠিক ঠিক মনে হয়। বলবীর সিং এরও হয়েছিল তাই। সে যা কিছু ভাবছে ঠিক। যা কিছু বুঝেছে ঠিক। যে পথে চলেছে সে পথও ঠিক।

এই মনগড়া সব ঠিকই বেঠিক হয়ে গেছিল বলবীর সিং-এর শেষ পর্যন্ত।

দুপুর রোদ্দুরের প্রখর তেজটা কমেছে তখন। বিকেলের ছায়া-স্নিগ্ধ ঠাণ্ডামিঠে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বলবীর সিং-এর মনে-মুখে খুশির আমেজ। একা চলার মুক্তিস্বাদ জীবনে পেয়েছে এই প্রথম। এই প্রথম যেন নতুন করে জন্মেছে সে এক নতুন আনন্দের দুনিয়ায়। একবারও মনে হচ্ছে না সে একা। মনে হচ্ছে সে অনেক। একাই একশো।

পাহাড়-বনের জন্তু-জানোয়ার গাছ-গাছালির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। আমগাছটার তলায় ঝরনার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। তরতরিয়ে বয়ে চলেছে ঝরনার ফটিক জল। ঝরনার ধার ধরে পাহাড় বেয়ে বেয়ে তরতরিয়ে নামতে লাগল সেও। জলে ভর্তি ডোবাটার কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। দু'হাতে

আঁজলা আঁজলা জল তুলে মাথায় মুখে দিতে লাগল। খেতে লাগল।

হাসছে বলবীর সিং। জল খাবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি মাথা টলে। গা ঝিমঝিম করে। চোখে ধোঁয়া দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। হুঁশ ফিরে আসে না আর কখনো কারো। সব ভুল। সব মিথ্যে। ভয় দেখানো স্রেফ। এ-জলে মৃত্যুবিষ নেই। তার প্রমাণ বলবীর সিং বেঁচে রয়েছে। পায়ের চাপে শুকনো ডালপালা ভেঙে যাওয়ার মড়মড় আওয়াজে ফিরে তাকাল সে ফার্ণ-গোল্ডেন-রড গাছগুলোর দিকে। হয়তো কোন বন্ধু তাকে নিয়ে কৌতুক করবার জন্য এই ভাবে শব্দ করেছে। তাকে ছেড়ে দিয়েও গাছের আড়ালে-আড়ালে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে।

ভুল ভাঙল। গাছগুলোর কাছে এসে ফাঁকে চোখ রেখে রেখে কোন লোককে দেখতে পেল না সে। দেখতে পেল কেবল মখমল-মসৃণ শিং নাড়তে নাড়তে পশ্চিম দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে একটা শম্বর। শম্বরটা যে খুব ভয় পেয়েছে, ওর আকাশ ফাটানো চিৎকারে তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। ওর চিৎকারের সঙ্গে নীলরঙা ম্যাগপাই পাখি দুটোও গলা মিলিয়ে ভয় ধরানো চিৎকার করছে।

এদের এ-ভাবের চিৎকারের পিছনে, দৌড়নোর পিছনে, ওড়ার পিছনে যে একটা সত্যি ভয়ের কারণ আত্মগোপন করে থাকে, পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা ভালো রকমেই জানে বলবীর সিং। অন্য সময় হলে সে-ও ভয় পেত। আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় খুঁজতে দৌড়দৌড়ি করত দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। সে জানে, এই দৌড়দৌড়ির ফলেই অনেকে বাঁচতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। আবার স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেও একই দশায় পড়তে হয়েছে কাউকে কাউকে।

এতসব জানা সত্ত্বেও, শম্বর-ম্যাগপাই-এর অলক্ষুণে চিৎকার শুনেও ঘাবড়াল না বলবীর সিং। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে নির্দ্ধিধায় চলতে শুরু করে দিল আবার। একটা অজানা অফুরন্ত আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে তার ভিতরে। সে বীর। নামে যেমন প্রকৃতিতেও

তেমন। এই থকগাঁও-এর মধ্যে তার সমকক্ষ নেই আর কেউ।

মনে মনেই নিজের গর্ব-অহঙ্কারের তারিফ করতে করতে বলবীর সিং-এর বুকখানা ফুলে দশহাত হয়ে উঠতে লাগল যেন। নিজেকে খুব আশ্চর্য ঠেকল ওর। কেমন করে কোন্ যাত্নমন্ত্রের প্রভাবে হঠাৎ এরকম হয়ে গেল ও। আগেকার মনটা অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে একেবারে। মনে হচ্ছে সে সকলের চেয়ে জ্ঞানী। সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান। ভয়-ডর তার জন্য নয়। তুর্বলদের জন্য, অজ্ঞানীদের জন্য।

ইচ্ছে করেই কাঁটাঝোপের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে চলতে লাগল বলবীর সিং। কোন কিছু লক্ষ্যে পড়ে কি না। খারাপ কিছু পড়ছে না ওর চোখে। খারাপের ভিতর সৌন্দর্যের পসরাই দেখছে ও।

মাথার ওপর দিয়ে ম্যাগপাই পাখি তুটো একনাগাড়ে উড়তে উড়তে চলেছে। শম্বরটা ওপাশ দিয়ে ওর সামনে এসে পড়ে আবার দৌড়তে শুরু করল প্রাণপণে। এরা সাধারণত হিংস্র প্রাণঘাতী বাঘ বা অন্য জন্তুর আবির্ভাবেই এই রকম করে থাকে। এসব জানা-কথা বলবীর সিং-এর মনের কোণ থেকে, মুছে গেছে একেবারে। মৃত্যুর হয়তো মাদকতা আছে একটা। ম্যাগপাই-এর নীলরঙে বলবীর সিং-এর চোখে নেশা লাগছে। তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। তু'চোখে ঘুম নামছে বুঝি।

এই ভাবে আচ্ছন্নের মতো কতক্ষণ চলেছিল, কতক্ষণ কেটেছিল তার কোন খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল একটা হিমেল বাতাসের ঝাপটা লেগে সর্বশরীরে। সচেতন হয়ে উঠল বলবীর সিং। তুহাতের তালু ঘষে ঘষে গরম করতে লাগল। বুকের তলার রক্তটা বুঝি জমাট বেঁধে যাবে এক্ষুনি। সর্বাঙ্গে রক্ত চলাচলের জন্য পাহাড়ের ফাটল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দৌড়তে লাগল।

হঠাৎ পূবদিকে তাকিয়েই যেন কেমন হয়ে গেল বলবীর সিং। নেপাল পাহাড়ের পিছনে সূর্য ঢলে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্তলালে লাল হয়ে উঠেছে আকাশটা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটু। যতখানি দৃষ্টি যায়, চক্কর দিয়ে এল তু'চোখ।

ভয় ধরছে ভেতরে। দিশেহারা হয়ে পড়ছে। গাঁও-ডেরায় ফেরবার পথ থেকে একদম অন্য পথে সরে এসেছে। সঙ্গীদের সঙ্গ ছেড়ে বেকুবি করেছে বেশ বুঝতে পারছে। এতক্ষণ যেন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিক মানুষে ফিরে এসেছে আবার বলবীর সিং। জনমানবশূন্য পাহাড়-বনভূমিতে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রমাদ গণছে। কি করবে, কোথায় যাবে, কোথায় আশ্রয় পাবে ভেবে কোন কুল-কিনারা পাচ্ছে না।

অলক্ষ্যে থেকে একটা অশুভ ছায়া যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে তখন মানুষের অনুভূতি একটা অজানা আশঙ্কার আঁচ পায়। কেন পায় তা কেউ জানে না। কিন্তু তবু পায়। এক্ষেত্রে বলবীর সিংও সেই আঁচ পেতে লাগল বুঝি। মৃত্যুর বিভীষিকা অনুভূতির স্তরে স্তরে জেঁকে বসতে লাগল তার। বেরুবার সময় মা-বাবার ফিরতে বারণ করার কথাগুলো বার বার কানে বাজতে লাগল। দেরী হলে ফিরো না। সঙ্গীদের কাছ-ছাড়া হবে না মোটে। যে-ই বেপরোয়া হয়েছে, তারই বিপদ ঘটেছে। অনেক সময় অনেককে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে—

মায়ের সজল তু'চোখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেবল বলবীর সিং-এর।

বাড়িতে ফেরবার পথ দেখতে পাচ্ছে না চোখের সামনে। যেখান থেকে আসছিল, সেই টনকপুর বাজারে ফিরে যাবারও পথ দেখতে পাচ্ছে না। পেলেও কোন জায়গায় পৌছনো সম্ভব নয় সন্ধ্যের আগে। সন্ধ্যে নামছে। অন্ধকারে যেন · আলোর ক্ষীণরেখা দেখতে পেল বলবীর সিং। পূর্ণিমা হয়ে গেছে সবে তু'দিন আগে। চাঁদ উঠবে খানিক পরে। জ্যোৎস্না ঝরে পড়বে আকাশ থেকে। পাহাড়ী ছেলের পাথুরে রাস্তায় চলতে অসুবিধে হবে না। জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে পারবে।

কিছুক্ষণ পর সামান্য একটু ক্ষয়া চাঁদ উঠল আকাশে। খুব সচেতন হয়ে চলছে বলবীর সিং। বাঁচবার আকুলি-বিকুলিই তাকে

ঠেলে ঠেলে চলাচ্ছে। বলবীর সিং তার ভীতসন্ত্রস্ত মন আর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারছে না আর।

জামবনটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে আচমকা ও কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল স্পষ্ট। চমকে উঠল মুহূর্তে—কি যে হয়ে গেল কিছু বুঝে উঠতে পারল না। কোথা থেকে যে অত শক্তি পেল, ভাববার অবসর পেল না। প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের দিকে।

বেশ বুঝতে পারছে, জামবনের আড়ালে তার পা ফেলার সমান তালে তালে পা ফেলে তাকে অনুসরণ করে দৌড়চ্ছে অন্যজন। সময় সময় মনে হচ্ছে যেন একজন নয়, আরো কেউ কেউ আছে। একসঙ্গে অনেকের পায়ের শব্দ।

এত পায়ের শব্দের কথা শোনেনি এখানের ভয়াবহ কাহিনী শোনার সময়। হয়তো মনের ভ্রম। ভয় থেকে উৎপত্তি। একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছে আবার। বোধহয় শোনা কথাই সন্ধ্যে নামতে মনের কানে প্রতিশব্দ হয়ে বেজে উঠছে নিজেরই পায়ের শব্দ। এই ভাবেই মনের চোখে এবার শোনা কথারই অনেক রূপ দেখতে পাবে। পূর্ণমাত্রায় মনের সাহস বজায় রাখতে এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে বলবীর সিং পথ চলতে লাগল।

খানিক যেতে না যেতেই আবার একটা ধাক্কা খেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না প্রথমে। দু'হাতে চোখ রগড়ে নিল বারবার। না, মনের ভুল নয়, চোখের ভুল নয়। যা দেখেছে সত্যি। যা দেখছে সত্যি। তবে এ-দেখা যে একেবারে দ্বিধাসংশয় মুক্ত তা নয়। যাকে দেখছে, সে শরীরী না অশরীরী—কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে। জায়গাটা সম্বন্ধে বহু রকমের রটনা অনেকেরই কানে কানে হেঁটে বেড়ায় প্রায় সময়। অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই মাটিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কেউ কেউ। ওদের অতৃপ্ত আত্মাই আসে নাকি এখানে। ঘুরে বেড়ায় নাকি পাহাড়ের চূড়োয়, খাদে, বনজঙ্গলে গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

এসব মেনে নেয়নি কোনদিন বলবীর সিং। বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এই মুহূর্তের পরিবেশ পরিস্থিতিতে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সাহসের ভিতে বিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরছে।

জামবনটা পেরিয়ে এসেছে। এদিকটা বেশ ফাঁকা। একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের ব্যবধান অনেকখানি। গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে রেখে চলতে গিয়ে ছায়ামূর্তিটা বালিমাটির বুকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে অন্য গাছের গুঁড়ির আড়ালে এসে পৌঁছচ্ছে। বুকটা কেঁপে উঠল বলবীর সিং-এর। এ যেন শিকারীর শিকার ধরবার প্রস্তুতি চলছে। ছায়ামূর্তি তাকে নজরবন্দী করে রেখেছে বেশ বুঝতে পারছে।

অশরীরী নয় ও, শরীরী। অশরীরীদের কুলুজিতে একটা গাছ থেকে আর একটার ব্যবধান পূরণ করতে দেরী লাগে না একটুও। চোখের পলক পড়ার আগেই কার্য সমাধা হয়ে যায়। কিন্তু এখানে হামাগুড়ি দিয়ে পূরণ করতে হচ্ছে। এ ছায়ামূর্তি নির্ঘাৎ মানুষ। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মিশমিশে কালো বীভৎস-দর্শন মানুষটা শেষ গাছটার তলায় এসে উঠে দাঁড়াল। এর পর আর গাছ নেই খানিক দূর পর্যন্ত। হয়তো মাথায় নতুন কিছু মতলব আঁটছে বলেই তার চলার পথে অনুসরণ করছে না আর।

করবে না যে এমন কোন কথা নেই। হঠাৎ ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে তার ওপর। পড়লে সেও ছেড়ে কথা কইবে না। যত শক্তিই ধরুক না লোকটা, মস্ত সুবিধে—একা। ওকে ঘায়েল করতে অসুবিধে হবে না কোন। ঠাকুর্দার রক্ত বয়ে যাচ্ছে বলবীর সিং-এর ধমনীতে শিরা-উপশিরায়। জঙ্গলে বাঘের খপ্পরে একা পড়ে গেছল একবার ঠাকুর্দা। তার মতো সঙ্গীরা পালিয়ে গেছল ওকে ছেড়েও। বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়বার মুখেই ধারালো টাঙি নিয়ে আক্রমণ করেছিল ঠাকুর্দা। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দার হাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল বাঘটার।

যাকে দেখল, সে এদেশের নয়। রঙে চেহারায়ই মালুম হচ্ছে। গুজব—কিছুদিন হল এসেছে এখানে। একজনকে দেখলেও—শুনেছে,

আরো নাকি অন্য অন্য লোক আছে এদের দলের চারদিকে ছড়ানো। লোকগুলো বাঘের চেয়েও না কি হিংস্র। দেরী হলে তবুও বাঘকে মারতে পারা যায় ধরতে পারা যায়। কিন্তু এদের ব্যাপারে কেউ কিছুই করতে পারছে না। বছর খানেক ধরে ওদের ধরবার জন্য চেষ্টা চলছে দারুণ ভাবে। সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ওরা পথিকের সর্বস্ব লুঠ করে নেয় মওকা বুঝে। কেউ বাধা দিতে গেলে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

এ-হেন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ধন-প্রাণ বাঁচাবার জন্যই কতকগুলো এলাকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব এলাকার ধারে কাছে আসে না কেউ। জিদের বশে এসেছে বলবীর সিং। বাড়ির লোকের কথায় অবিশ্বাস করার ফল হাতে হাতে ফলতে বসেছে। তার প্রমাণ সাক্ষাৎ যমদূত দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছতলায়।

মির্জাই-এর তলায় কোমরের কাছে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে নিল ভালো করে। কোমরে জড়ানো টাকার থলিটা পাক দিয়ে শক্ত করে ঠিক বাঁধা আছে। ডানদিকে ভোজালিটাও ঠিক আছে। ভোজালিটার ওপর হাত রেখে চলছে। এ-পথে এ-সময় এটাই একমাত্র সম্বল।

চোখ কান বুদ্ধি সজাগ রেখেই চলছে বলবীর সিং। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে। বিশেষ করে পিছনে। লোকটা এখনো দাঁড়িয়েই আছে একভাবে। কিন্তু ওর মুখটা ঘুরছে ফিরছে তার চলার গতির সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যাগপাই পাখি দুটো এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। আচমকা এসে মাথার ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিকৃত স্বর পাহাড় বনভূমি কাঁপিয়ে তুলে দু'কানের পরদা ফাটিয়ে দিল যেন। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষটা। ছুটে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ডানপাশ ফিরতেই বুক টিপ টিপ করে উঠল আরো। প্রথম জনের মতো ওই রকম চেহারারই আর একজনও ছুটে আসছে ওদিক থেকে।

বুঝতে আর বাকি রইল না বলবীর সিং-এর—বিকৃত স্বরের চিৎকারটা কিসের ইঙ্গিত। একজন শিকারী আর একজনকে কাছে ডাকল। শিকার ফাঁদে পড়ে গেছে। ফাঁদ থেকে যাতে বেরুতে না পারে—ভালো ভাবে শক্ত করে আটকে ফেলতে হবে ঘিরে ফেলে।

সম্মুখ সমরে একজনের সঙ্গে লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল বলবীর সিং। এখন দেখছে দুজন। আরো আছে কি না, তাই বা কে জানে। এখানে যদি হারিয়ে যায় বলবীর সিং—কেউ কোন দিন জানতেও পারবে না কি করে কোন্‌খানে হারাল সে।

জানছে এ মরণফাঁদ থেকে উদ্ধাব হবার কোন উপায় নেই আর তার, তবুও খাপ থেকে ভোজালিটা বার করে নিল তাড়াতাড়ি। টনকপুর বাজারে বাদাম-কমলালেবু বিক্রির টাকার থলিটায় হাত বুলিয়ে নিল একবার। তাকে শেষ না করে কোমর থেকে খুলে নিতে পারবে না ওরা এটা। জীবন থাকতে সে এটা নিতে দেবেও না ওদের কিছুতেই। এই টাকা থেকেই তাদের পরিবারের জীবন চলে। এ টাকা মায়ের জীবন, ভাইবোনদের—সবার।

দাঁড়িয়ে পড়ল বলবীর সিং। দৌড়ে পালিয়ে এদের কব্জা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। আর তাছাড়া কোন পথই পাচ্ছে না কোন দিকে যাবার। মাথার ভিতর সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের রাস্তার নিশানা ঠিক করতে। একটা চৌকোণা পাথরের ওপর বসল নিজের অগোচরেই।

বসে বসে দেখছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে বলবীর সিং। লোক দুটো তার কাছ বরাবর এসে থমকে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ইঙ্গিতে কি যেন নীরবে বলল একজন আর একজনকে। তারপর যে ভাবে ওরা এসেছিল সেই ভাবেই ছুটতে ছুটতে চলে গেল আবার সেই পথ ধরেই।

দেখছে বলবীর সিং ডাইনে-বাঁয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। চলে যাচ্ছে ওরা দুজনে দু'দিকে। ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শিকারকে গ্রাসের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে চলে যাওয়া কেমন করে সম্ভব?

বলবীর সিং নিজের ডানহাতের শক্ত মুঠোয় ধরা ভোজালিটার দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় বেশ চকচক করছে। এতে ভয় পেয়ে চলে যাবার কোন কারণ নেই ওদের. ওদের, দুজনের হাতের ভোজালিও তার লক্ষ্য এড়ায়নি। এর চেয়ে ঢের বেশী বড়। ঢের বেশী চকচকে। হঠাৎ নীচের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠল বলবীর সিং। পায়ের তলায় দু'পাশে আর এক মৃত্যু-ফাঁদ—গভীর খাদ। চৌকোণা পাথরটার একটা কোণের সামান্য অংশ পাহাড়ের একটা দিকে ঠেকে আছে মাত্র। বাকি তিন দিক ফাঁকা। শূন্যে ঝুলছে। এই জন্যই শিকার ছেড়ে চলে গেছে শিকারীরা। শিকার ধরতে গিয়ে তাদের নিজেদের হারাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। দুর্বৃত্ত হলেও নিজেদের প্রাণের মমতা থেকে একপাও সরতে পারেনি ওরা। অপরের প্রাণ নেওয়া যাদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার, নিজের প্রাণ দেবার সময় তারাই আবার অতি ভীরু।

এবারে বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছে বলবীর সিং। এই খাদের ধার দিয়ে দিয়ে এদের খপ্পর থেকে বেরুবার চেষ্টা করবে সে। বেরুতে পারবে নিশ্চয়ই। যেখানে যেখানে খাদ, সেখান দিয়েই চলবে। অতি সন্তর্পণে বসে বসেই পাথরটা থেকে নেমে পড়ল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে চলতে শুরু করল আবার।

চলেছে তো চলেছেই। এবার কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কোন দিক থেকেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওকে ছেড়েছে দুর্বৃত্তরা তাহলে সত্যিই।

, অনেকটা পথ এসে গেছে। ম্যাগপাই পাখি দুটো আবার মাথার ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে গেল। দুর্বৃত্তরা ছেড়েছে তাকে কিন্তু এরা তো কিছুতেই ছাড়ছে না। এখানে আসার শুরু থেকেই মাঝে মাঝে ওই পাখি দুটো তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভাব হচ্ছে কে জানে। চিৎকার করে যেন একটা মহাবিপদের সঙ্কেতই জানিয়ে যাচ্ছে। এ-ধারণাটা এর আগে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, এখন তোলপাড় করছে ভিতরে।

একটা আশ্রয় একটা বিশ্বাসী মানুষকে পাবার জন্য বড্ড ছটফট করছে মন। ছুটতে ইচ্ছে করছে খুব। ছুটছে ছুটছে ছুটছে। সামনে কুঁড়েঘর দেখে ধড়ে প্রাণ এল যেন। লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছে এবার। আর ভয় নেই!

কুঁড়েঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আধ ভেজানো দরজার পাল্লায় টোকা মেরে আওয়াজ করল। কোন সাড়া পেল না ভিতর থেকে। আস্তে আস্তে ঠেলতে খুলে গেল দরজা। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দক্ষিণ দিকের ভাঙা জানলা দিয়ে। ঘরের মাঝখানে চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। ঘরে কেউ নেই। এটা একটা পোড়ো ঘর। ভিতরে ঢুকল বলবীর সিং। অবসন্ন হয়ে পড়েছে খুব। রাতের মতো নিজেকে লুকিয়ে রাখবার, মাথা গোঁজবার যে একটা জায়গা পেয়ে গেছে—এটাই মস্ত ভাগ্যের জোর তার।

ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জানলার দিকে গিয়ে বসল একটু বিশ্রাম করবার জন্য। রাতে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বৃথা পথ খুঁজে হয়রান হওয়ার চেয়ে এই আশ্রয়টুকু যথেষ্ট নিরাপদ। সকালে রাস্তা খুঁজে বার করা সহজ হবে।

ঘুমে দু'চোখ ঢুলে আসছে বলবীর সিং-এর। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাঁর এই করুণার জন্য—আশ্রয় মিলিয়ে দেবার জন্য। ঈশ্বরের স্মরণে বাধা পড়ল, ঘুম মাথায় উঠল পিঠে মাথায় গরম নিশ্বাস পড়তে।

পিছন ফিরে তাকাল। জানলার ভাঙা খুপীটায় একটা ছোট্ট মুখ আটকে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে ন'দশ বছরের ছেলের মুখ ওটা। ছেলেটার সর্বশরীর দেখে মনে হয় ও খুব হাঁপাচ্ছে। মুখ দিয়ে নাক দিয়ে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে ছাড়ছে। বাইরে থেকে ভাঙা খুপীটায় মুখ আটকে বলবীর সিংকে একদৃষ্টে দেখছে। চোখের পলক পড়ছে না।

ছেলেটাকে দেখে খুব আনন্দ হল বলবীর সিং-এর। মানুষের মুখ দেখতে চেয়েছিল। প্রকৃত মানুষের মুখ দেখতে পেয়েছে সে। এ যেন

ঈশ্বর প্রেরিত দেবশিশু। চোখে চোখ পড়তে ফিক করে হাসল ছেলেটি। বলল, তুমি কি ভয় পেয়েছ?

ঘাড় নাড়ল বলবীর সিং—না পায়নি।

হেসে উঠল জোরে ছেলেটি, তোমার সঙ্গে আছে কেউ?

আবারো ঘাড় নাড়ল বলবীর সিং—না কেউ নেই।

আমি কি তোমায় কোন সাহায্য করতে পারি?

কচিগলায় ভরসা দেওয়ার কথা শুনে ছেলেটাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভেবে বসল বলবীর সিং। তাকে উদ্ধার করতে এসেছেন স্বয়ং।

নিজের বিপদের কথা জানাল বলবীর সিং ছেলেটিকে। অনুরোধ করল তাকে উদ্ধার করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। ছেলেটি এদিক ওদিক তাকাল। কি যেন দেখল, কি দেখে হাসল। তারপর হাসি-মুখেই ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। লোক নিয়ে এসে নিয়ে যাচ্ছি তোমায়।

দৌড়ে চলে গেল ছেলেটি। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে দুজন লোক। যারা এল, তাদের দেখে কাঁপুনি শুরু হল ভিতরে। এরা বলবীর সিং-এর অজানা অচেনা নয়। ভেবেছিল, ওরা পালিয়ে গেছে, তাকে ছেড়েছে। তার ধারণা ভুল। পালানোটা ওদের মস্ত কৌশল। শিকারের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে নিজেদের কঠিন ফাঁদে আটকে ফেলা।

এবারে এদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু তার। বাঁচবার কোন আশা নেই। সব দিক দিয়েই নিরুপায় সে। বাচ্চাটা দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। দেবশিশুর মুখোশ পরা সাক্ষাৎ দানব ও। মানুষ শিকারী দুটোর মতো ওরও হাতের ভোজালিটা তাক করা রয়েছে তার দিকে। ওদের চর বাচ্চাটা। এখন দিনের আলোর মতো সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে। পোড়ো ঘরটায় আসবার আগে অবধি এতখানি পথ নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে অনুসরণ করে চলেছিল দুর্বৃত্তরা তাকে।

অনেককে এই ভাবেই সকলের অগোচরে গুমখুন করেছে ওরা।

এদের একজনকেও শেষ করে মরতে পারে যদি সে, তাহলে তার অনেক পুণ্যি। মরেও শান্তি।

যে রকম তৈরী ওরা, সামনাসামনি আক্রমণ প্রতিরোধ খুব মুশকিল। ভোজালিটা বার করেই ওদের সামনে থেকে কোণের দিকে সরে গেল। মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল কিছু বুঝতে পারল না। বোঝবার আগেই সব কিছু ঘটে গেল।

কোণটায় সরে যাওয়া মাত্র সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। পায়ের তলার নরম মাটি ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠে সজোরে ওপর দিকে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিল মেঝেয়।

বলবীর সিং-এর পড়ে যাওয়ার সুযোগ নিতে চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্তদের একজন। ভোজালি উঁচিয়ে এগিয়ে এল। ঝাঁপিয়ে পড়বে। পড়া হল না। আর্তনাদ করে নিজেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বলবীর সিং-এর সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে গেছে। হাত-পা দেহের কোন অঙ্গই নড়ছে না। চেষ্টা করেও তুলতে পারছে না। চোখের পলক পড়ছে না। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। রুদ্ধনিশ্বাসে দেখছে।

মেঝেয় পা রাখেনি সে। রেখেছিল বিষাক্ত পাহাড়ী হ্যামাড্রায়াড সাপের দেহের ওপর। সাপটার সুখনিদ্রা ভেঙে যেতে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠেছিল। বিরাট লম্বা সাপটা ভীষণ হয়ে উঠেছিল। অসংখ্য নিশ্বাসের গর্জনেগর্জে ছিল। সরার মতো ফণা বিস্তার করে, চেরা লকলকে লাল জিভ বার করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল মানুষ-প্রমাণ। বলবীর সিংকে মরণ ছোবল মারবার মুখে মানুষ শিকারীর প্রথম জন সামনে এসে পড়ায় বিযাক্ত ছোবল বসিয়ে দিয়েছিল ওর পিঠেই।

দ্বিতীর জন আর বাচ্চাটা প্রাণভয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছল বলবীর সিংকে ছেড়ে। বলবীর সিংকে ওরা ছাড়লেও হ্যামাড্রায়াড ওদের পিছু ছাড়ল না। বিদ্যুৎ গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওদের পিছু পিছু।

এরপর আর কিছু জানে না সে। কি ভাবে রাত কেটেছে— ঘুমিয়ে না একটা আচ্ছন্ন অবস্থায়—তার কিছুই মনে নেই একেবারে।

ভোরের আলো যখন চোখে এসে পড়ল, তখন সচেতন হয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল রাতের বিভীষিকা। মনে পড়ল এক এক করে সব। শিউরে উঠল সর্বশরীর সামনেই দুর্বৃত্তটার মৃতদেহ দেখে। ওর সারা অঙ্গ নীলে নীল হয়ে গেছে।

উদয়সূর্যের আলো লেগে যেন দেহমন স্নায়ু সতেজ সবল হয়ে উঠল আবার বলবীর সিং-এর। উঠে দাঁড়াল। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল কুঁড়ে ঘর থেকে। ফিরে যাবে বাবা-মার কাছে। আবার।

কুমায়ুন রেজিমেণ্টের অবসর-প্রাপ্ত হাবিলদার বলবীর সিং-এর মুখে তার নিজের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। একটা বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে নতুন করে উপস্থিত হল আর একটা।

গায়ের মির্জাইটা খুলে ফেলে বলবীর সিং দেখাল। জানাল, আঠারো বছর বয়সের জীবন তার যেমন বিস্ময়কর—অক্ষত দেহে বেঁচেছে, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও শত্রুপক্ষের গোলাবৃষ্টির মধ্যে যেখানে তার দলের একজনও ফেরেনি—সেখানে আশ্চর্যভাবে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে সে।

---